শ্রীরামকৃষ্ণ চৌধুরী

আশ্বিন—১৩২৮

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কালিকা প্রেস

২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তর্কসিদ্ধান্ত

মহাশয়ের শ্রীচরণে

উপহার

নিবেদন

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় 'ঈশানী' নামে একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। সেই উপন্যাস-খানি পাঠ করিয়া আমি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এবং আরও অনেকের সহিত আলোচনা করি। সেই আলোচনার ফল আমার এই **'সন্তান'** উপন্যাস। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জলধর বাবু যে ভাবে 'ঈশানী'তে একটী সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন, আমি যদিও সেভাবে মীমাংসা করি নাই; কিন্তু প্রকৃত সমস্যার সমাধানে মতভেদ নাই। তাঁহার 'ঈশানী'ই আমাকে এই উপন্যাসখানি রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, এ কথা আমাকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। আমার রচনায় অনেক ত্রুটী আছে, ঘটনা-বিন্যাসেও হয় ত অনেক অভাব পরিলক্ষিত হইবে; কিন্তু, সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের মহিমা ও গরিমা কীর্ত্তনের মহান্ উদ্দেশ্য আমি কখনও বিস্মৃত হই নাই;—আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই নাই;—সহস্র ত্রুটীর মধ্যে ইহাই আমার সাধনা ও কামনার বিষয় ছিল। এই নিবেদনে ইহার অধিক কিছু বলিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

আহারবেলমা }
বর্দ্ধমান। }

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা

গ্রন্থকার প্রণীত

ব্রাহ্মণ-পরিবার—সুখপাঠ্য গল্প পুস্তক - - - - - - - - - -
- সুদৃশ্য বাঁধাই ॥০

দেওয়ানজী—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস - - - - - - - -
- সুন্দর বাঁধাই ॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা।

সন্তান

জয়রাম স্মৃতিতীর্থ ও অভিরাম তর্কতীর্থ দুই ভাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করেন। গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণই তাঁহাদের যজমান। পৈতৃক জমি-জমাও যৎসামান্য আছে। কুল-শীল খুব ভাল। নৈকষ্য কুলীন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহারও দান প্রতিগ্রহ করেন না। বংশের কেহ কখনও চাকুরী করেন নাই; সেই জন্য বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াও আজ পর্য্যন্ত এই দুই ভাই বড় বড় ইস্কুলে প্রধান অধ্যাপকের পদে আহুত হইয়াও কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। গ্রামের জমীদার মণিমোহন মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত। দেশের সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিবার জন্য স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে আহ্বান করিলে বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এ পদ গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়াতে জমীদার মহাশয় বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন। গ্রামের কৃতবিদ্য শিক্ষিত লোকই এই ইস্কুলে মাষ্টারী ও পণ্ডিতী পদ পাইয়া নিজেদের ধন্য মনে করিয়াছেন,

এবং প্রাণ দিয়া ইস্কুলের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশের প্রত্যেকেই জমীদার মহাশয়ের আহ্বানে এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। আর এই শিক্ষিত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কোন্ সাহসে যে নিজেদের কুল-শীলের দোহাই দিয়া এ পদ গ্রহণ করিলেন না,—তাহা জমীদার মহাশয় বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মণিমোহনবাবু মনের ভাব গোপন করিয়া একদিন শেষবার স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে বলিলেন,—"দেখুন, গ্রামেরই শিক্ষিত লোক লইয়া ইস্কুলের সব মাষ্টার পণ্ডিত করা হইয়াছে। আমার ইচ্ছা নয় যে, অন্য গ্রামের লোক আসিয়া এই 'হেড পণ্ডিতে'র পদ লয়। আমি দেখাইতে চাই—আমার গ্রাম সব বিষয়ে অন্য গ্রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "এ কথা খুব ভাল; কিন্তু, যাহাদের বিদ্যাদান করা বংশ-প্রথা এবং অধ্যাপনাই জাতিবৃত্তি, তাহারা কিসের জন্য এত বড় ত্যাগের মূল্য লইয়া হীন হইতে চাহিবে। আমি বিনা বেতনে আপনার স্থাপিত ইস্কুলে পণ্ডিতী করিতে পারি; কিন্তু বেতন স্বীকার করিয়া আপনার কর্ম্মচারী হইতে পারি না।"

"ব্রাহ্মণের বৃত্তিভোগী হওয়ায় দোষ কি? প্রত্যেক ব্রাহ্মণই এখন পর্য্যন্ত লিখিতেছেন—পেশা 'বৃত্তিভোগী'। বেতন না লন, একটা মাসিক দক্ষিণা—কি বৃত্তিরই ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিই?"

"মণিবাবু, আপনার সাধু উদ্দেশ্যের জয় হউক। 'মনকে চোখ ঠারা' যে একটা কথা আছে, সেটা ত সকলেই জানে। আর এ ও জানা উচিত —যার যা বিশ্বাস সেটা নষ্ট না করাই ভাল। আমার বিশ্বাস, দানের জন্য যে পুণ্য তাহার ফল একমাত্র ভগবানেরই নিকট মাথা পাতিয়া লইতে পারা যায়; অন্যের নিকট তাহার ফল গ্রহণ করিলে সেই পুণ্য পণ্যে

পরিণত হয়। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন। আমি কোন প্রকারেই আমার পিতৃপ্রথা হইতে অন্য প্রথা অবলম্বন করিতে পারিব না।"

রাগত স্বরে মণিবাবু বলিলেন, "যদি এমন দিন আসে, যে দিন পেটের দায়ে আপনার পরিজন অনাহারে মারা যাইতে বসে ;—সে দিনও নয় ?"

"যদি এমন দিনই আসে, তবে সে দিনের জন্য ঐ উৰ্দ্ধতন পুরুষের পুণ্যে তাঁহাদেরই আদর্শ সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিব। যাঁর শাসন মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য—তাঁহারই বিধানের অপেক্ষা করিব।" এই বলিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নিজের দক্ষিণ হস্ত উপরে উঠাইয়া আকাশের দিকে তর্জ্জনী হেলাইয়া রহিলেন। জমীদার মহাশয়ের পার্শ্বচরেরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সেখানে বাস্তবিকই কেহ আছে কি না। যখন দেখিল, কেহই নাই, তখন সকলেই একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলিল—"স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, ওখানে কেহ কখনও থাকে নাই,—থাকিতে পারে না। ঐ শূন্যে—ঐ আকাশে কি পেট ভরে ?"

জমীদার মহাশয় ও তাঁহার পার্শ্বচরেরা হাস্যকৌতুকে প্রায় নাচিয়া উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সেই হাস্য-কৌতুকের তরঙ্গের মধ্যেও নিজের উত্তোলিত হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়াই ধীরে ধীরে সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

২

মণিবাবু সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কনিষ্ঠ অভিরাম তর্কতীর্থকেই এই হেড পণ্ডিতের পদ দেওয়া যাউক। আর যাহাতে দুই ভাইয়ে মিল না থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করা যাউক। মণিবাবুর প্রকৃতি একান্ত জেদী। যাহা নিজের

ধারণায় ভাল বুঝিবেন, তাহা যে কোন উপায়ে কার্য্যে পরিণত করিবেনই ; আবাল্যের এই ধারণা কোনও প্রকারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

মণিবাবুর পিতা স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই জেদের বশবর্ত্তী হইয়া শেষ জীবনে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শশাঙ্কমোহন একমাত্র পুত্র মণিমোহনকে ইংরাজী শিক্ষার পরিবর্ত্তে দেশ-চলন উর্দ্দু শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মণিবাবু পিতার মুখের উপর বলিয়াছিলেন যে, "মুসলমানের যুগ শেষ হইয়াছে, এখন ও-বিদ্যা আর কাজে লাগিবে না—আমি যাঁহাদের রাজত্বে বাস করি, তাঁহাদেরই ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজে উন্নত হইব ও দেশকে উন্নত করিব।"

এ কথা শুনিয়া শশাঙ্কমোহন একমাত্র পুত্র মণিবাবুকে বলিয়াছিলেন —"মাত্র এক বৎসর কাল তোমার ইচ্ছামত শিক্ষালাভ করিবার জন্য সময় দিলাম। তাহার পর তোমাকে বিনা বিচারে আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া এই মুসলমানের ভাষা উর্দ্দুই শিক্ষা করিতে হইবে।"

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। পুত্র পিতার নিকট পুনরায় এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিল। কিন্তু হাকিম বদল হয়, হুকুম বহাল থাকে ; এই কথা মতই শশাঙ্কমোহনও অটল হইয়া বলিলেন,—"আমার অবাধ্য পুত্র আমার ত্যাজ্য। আমার সম্মুখ হইতে র হইয়া যাও। এখানে তোমার স্থান নাই।"

মণিবাবু তৎক্ষণাৎ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশত্যাগী হইল। তখন মণিমোহনের বয়স মাত্র পনের বৎসর। সেই বয়সে

জেদের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের চেষ্টায়—নিজের ক্ষমতায় যে লোক দশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছেন তাহার যে একটা বিশেষ কিছু শক্তি আছেই—যাহা সাধারণের নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মণিমোহন দেশত্যাগী হইলে পর শশাঙ্কমোহন কর্ম্মচারীদের বলিলেন; "কেহ কখনও তাহার সন্ধান করিও না। আমার পুত্র নাই। আমার পত্নী নাই। আমি পুনরায় দারপরিগ্রহ গ্রহণ করিয়া বংশ রক্ষা করিতে চাই। দেখি আমার বংশ থাকে কি না?"

সপ্তাহের মধ্যে কথামত কার্য্য শেষ করিয়া শশাঙ্কমোহন নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু মনের মত কার্য্য করিবার শক্তি মানুষের হাতে ভগবান্ দেন নাই; দিলেও সব মানুষ সে উপায় কখনও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। শশাঙ্কমোহন বিবাহ করিলেন। একদিন দুইদিন করিয়া দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বংশ রক্ষার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। শেষে অতর্কিতে একদিন শমনের ডাক পড়িল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সে ডাকে একদিন সকলকেই যাইতে হয়। তাহার সময় অসময় নাই। সুদিন নাই কুদিন নাই। সাধ-অসাধ কোনও ওজর আপত্তি চলে না—তাই এই ডাকের নাম 'শেষ ডাক'। শশাঙ্কমোহনের শেষ ডাকের দিনেও পুত্রের প্রতি স্নেহ মমতা ফিরিয়া আসিল না। নূতন গৃহিণীর শত অনুরোধেও পুত্রের সামান্য দোষ মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাবতীয় সম্পত্তির উইল করিয়া নূতন গৃহিণীকে অর্পণ করিলেন। দান-বিক্রয়ের ভারও তাঁহাকে দিতে বিস্মৃত হন নাই। যথাসময়ে স্বকর্ম্মোচিত লোকে শশাঙ্কমোহন গমন করিলে নূতন গৃহিণী ওরফে মণিবাবুর

বিমাতা ভবসুন্দরী কলিকাতার লোকারণ্যের মধ্য হইতে মণিবাবুর সন্ধান করিলেন। তারপর নিজে মণিবাবুর নিকট আসিয়া—হাতে ধরিয়া পিতৃ শ্রাদ্ধের জন্য তাহাকে দেশে লইয়া যান। পুত্রের ইচ্ছামত স্বামীর শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে ভবসুন্দরী যাবতীয় সম্পত্তি মণিবাবুকে অর্পণ করিয়া তীর্থবাসী হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মণিবাবুর শত অনুরোধেও তিনি আর দেশে রহিলেন না। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে একদিন ভবসুন্দরী যাবতীয় সম্পত্তির একখানি উইল লইয়া মণিবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "মায়ের দান—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর; সংসারী হও। বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া একবার আমার নিকট যাইও, আমাকে দেখাইয়া আনিও। আমার অভাব অভিযোগ যদি কখনও তোমার নিকট আসে, তাহা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিও। আর আমার কোন ইচ্ছা নাই—আকাঙ্ক্ষা নাই। আমায় কি দিবে দাও—সারাজীবন যেন তীর্থে দান-ধ্যান করিয়া তোমার মায়ের মত থাকিতে পারি।"

'বনের বাঘও বাশ হয়' এই যে কথা আছে, তাহা সফল করিবার শক্তি সব মানুষের থাকে না। আবার যাহার থাকে, তাহার সে শক্তি এত বেশী থাকে, যাহা দেখিয়া লোকের অনেক শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়।

মণিবাবু যখন পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য দশ বৎসর পরে দেশে আসেন, তখন একবারও ভাবেন নাই যে, বিমাতাকে প্রীতি ভক্তির চক্ষে দেখিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু বিমাতার ব্যবহারে মনের সে উষ্ণভাব একেবারে জল হইয়া গেল। বহুদিন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত—পিতৃ-শাসনে কঠোর-প্রকৃতি পাষাণপ্রাণ মণিমোহন এই একদিন মাত্র জীবনে চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া ভবসুন্দরীর পদপ্রান্তে বসিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন,—"মা, মায়ের আদর যখন পাইয়াছিলাম,

তখন অতি শিশু। মাকে মনেই পড়ে না। আজ যদি মায়ের প্রাণ লইয়া অবোধ সন্তানের নিকট দাঁড়াইলে, তবে তার সব দোষ ক্ষমা করিয়া এইখানেই কিছুদিন থাক, তারপর মায়ে-পোয়ে তীর্থবাসী হইব।”

বিধবা যদি তাঁর মৃত স্বামীকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিশাইয়া বসেন, স্বামীর মৃত্যুতে তিনি দেবত্বই প্রাপ্ত হইয়াছেন এই ধারণায় মনঃপ্রাণ অর্পণ করেন, তাহা হইলে বৈধব্যের চরম পরিণতিতে যে পূর্ণ ধর্ম্ম আছে, তাহার আকর্ষণে তাঁহাকে দেব-সামীপ্যে লইয়া যাইবেই। এই দেব-সামীপ্যে —এই দৃঢ় বিশ্বাসে বৈধব্যের জাগতিক তুচ্ছ কঠোরতা, স্নেহ মায়া বন্ধনের অসারত্ব তিনি যেভাবে বুঝিবেন, সে ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভবসুন্দরী প্রাণপোরা স্নেহ মমতা লইয়া মণিমোহনের মায়ায় আর আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই মণিমোহনের মত লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। বৃদ্ধ দেওয়ানজী মণিমোহনের আদেশে ভবসুন্দরীর সঙ্গে আসিয়া তাঁহার বৃন্দাবন-বাসের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মাতৃগুণে আকৃষ্ট মণিমোহন নগদ টাকা একটীও নিজের বলিতে রাখেন নাই। পিতার সঞ্চিত অর্থ যত কিছু ছিল, সবই মায়ের জন্য দেওয়ানজীর সঙ্গে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। ভবসুন্দরী সে টাকা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, মায়ের দান স্থাবর সম্পত্তিই পুত্র গ্রহণ করিয়াছে, অভিমানী মণিমোহন পিতার ত্যাজ্য হইয়াছিল বলিয়া, যে টাকা তাহার পিতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পর্শও করে নাই। যাহার এত বড় অভিমান, যে এত বড় জেদী,—সে হয় ত ভালই হইবে, নয় ত একেবারেই অধঃপাতে যাইবে। মনকে বুঝাইলেন, তীর্থে আসিয়া আর এ সব চিন্তা কেন ; এখন যে তাঁহার অন্তিম চিন্তাই সার সম্বল।

৩

মণিবাবু স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিরাম তর্কতীর্থকে ইস্কুলের হেড পণ্ডিতী দিয়াছেন। তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা-যত্নে সে পদের কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠ যে পদ গ্রহণ করিলেন না, কনিষ্ঠ বিনা বিচারে তাহাই গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল, মণিবাবুর ভয়ে জ্যেষ্ঠ নিজের ত্রুটী সংশোধন করিতেই কনিষ্ঠকে এই সৎ পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। যেদিন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় মণিবাবুকে ক্ষুব্ধ করিয়া চলিয়া যান, তাহার দুই চারিদিন পরে, মণিবাবু আসিয়া অভিরাম তর্ক-তীর্থকে ডাকিয়া লইয়া গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে দিয়া অনুরোধ করাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। অনেকে বলেন, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যে পিতৃ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পূর্ব্বে এই কার্য্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা তর্কতীর্থ মহাশয় জানিতেন না। আবার অনেকে বলেন, দুই ভাই একই বংশের সন্তান হইলেও কি মতি-গতি একই হইবে? এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, একই মাটীতে একজাতীয় বৃক্ষের ফল ভিন্ন হইয়াছে। আকারে, স্বাদে, বর্ণে কোন প্রকারেই তাহা সমান দেখা যায় না। মানুষ ত আর পৃথিবী ছাড়া নয়; সকলের ধারণাও এক নয়; যে যেমন বুঝে সে তাহাই করে।

স্মৃতিতীর্থ ও তর্কতীর্থ দুই ভাইয়ের এই ঘটনা লইয়া জীবনে সর্ব্বপ্রথম মনোমালিন্য ঘটে। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় পিতৃভক্তিতে অচল হইয়া পৈতৃক প্রথায় মুগ্ধ থাকিয়া দেশ-কাল বুঝিয়া নিজের শক্তিমত আজ পর্য্যন্ত ঠিকই

আছেন। তর্কতীর্থ মহাশয় শিক্ষার সঙ্গে ন্যায়ের বিচারে নিজের মার্জ্জিত বুদ্ধিতে দাদার এই কাজ কোন প্রকারে সমর্থন করিতে না পারিয়া জাতি-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই মনোমালিন্যের ফলই দুই ভাইয়ের পৃথক্ অন্নের কারণ।

সামান্য জমি-জমা ও শিষ্য যজমান যাহা কিছু ছিল, দুই ভাইয়েই নিজেদের মধ্যস্থতায় তুল্য অংশে ভাগ করিয়া লইলেন; বাহিরের কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইল না; কোন গণ্ডগোলও হইল না। বাহিরের কেহ এই পৃথক্ অন্নের হেতুও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের একটী কন্যা ও একটী পুত্র। কন্যাটী জ্যেষ্ঠা, তাহার নাম মনোরমা। পুত্রটী কনিষ্ঠ, তাহার নাম কমলারঞ্জন। মনোরমার বয়স দশ বৎসর মাত্র। কমলারঞ্জন সবেমাত্র দুই বৎসরের। এই ক্ষুদ্র সংসার লইয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়, বাড়ীর বাহির দিকের অংশে বাস করিতে লাগিলেন। বাহির দিকের অংশ পূর্ব্বে সদর বাড়ী রূপেই ব্যবহৃত হইত।

তর্কতীর্থ মহাশয় নিজের একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা সরমা ও স্ত্রীকে লইয়া ভিতর বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন।

সামান্য সংসার হইলেও অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের উপর ভার পড়িল বেশী। লোক-লৌকিকতা, পূজা-পার্ব্বণ, পৈতৃক প্রথা সবই রক্ষা করিতে হইল জ্যেষ্ঠকে। ইহাই যে দেশের প্রথা। বাঙ্গালার ভাগ্যে বাঙ্গালার ভাগ্যে এই নীতিতেই যে বিবাদের প্রথম সূত্রপাত জ্ঞাতিত্বের সৃষ্টি।

এই প্রকারে একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। নানা কারণে ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনায় এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের মনোমালিন্য ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল, তাঁহাদের সংসার যে দুই সহোদরের সংসার,—পূর্ব্বে কখনও যে একান্নবর্ত্তী ছিল,

তাহাতে জানা লোকেরও মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। কেহ কাহারও ছায়া মাড়াইতে চাহেন না। যখন দুই ভাইয়ের মনের অবস্থা এই প্রকার তখনও বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় নাই। দুই যায়ে তখনও এক প্রাণ; পরস্পর সহানুভূতির চক্ষে দেখে। বাহ্যিক ব্যবহার সকল প্রকারে বন্ধ হইয়া যাইলেও দুই যায়ের তিনটী পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাদের কোন বাতাসই গায়ে লাগিতে পারে নাই। মনোরমা এখন একটু বড় হইয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনাও হইয়াছে। সে অনেক সময় বাপের ও কাকার মনের ভাষা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে যখন তাহার বাপ ও কাকা ক্রমশঃ চড়িয়া উঠিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের একজনের হাত ধরিয়া টানিয়া অন্যত্র লইয়া যায়। আবার যখন এই বিবাদের পরিণাম, শত সহস্র দায় দফায় তাহার পিতাকে ব্যতিব্যস্ত দেখে, তখন সে কাঁদিয়া ফেলে। সাংসারিক নানা দায়ে ব্যাপৃত হইয়াও স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কখনও কনিষ্ঠের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। তিনি নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে, নিজের শক্তিতে যাহা পারিতেন, তাহাই করিয়া যাইতেন। আর তর্কতীর্থ মহাশয়, সেই সব কর্ম্মের ক্রুটী, নিন্দা, সাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জ্যেষ্ঠের সংসার ভারাক্রান্ত মনঃপ্রাণের উপর বর্ষণ করিতেন। অনেক সময় সহ্য করিতে না পারিয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কনিষ্ঠেরও অনেক দোষ দেখাইয়া দিতেন; আর বলিতেন, "ভাই তুমি, তোমারও উচিত আমার এসব ক্রুটী হইতে না দেওয়া।"

দুই ভাইয়ের মনের অবস্থা যখন এই প্রকার, সেই সময় একদিন মণিবাবু স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে কাছারীতে ডাকাইলেন।

যেদিন হেড পণ্ডিতী পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়

মণিবাবুর নিকট হইতে চলিয়া আসেন, তাহার পর আর কাছারীতে যান নাই। পথে-ঘাটে দুই একবার মণিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পার্শ্বচর পরিবেষ্টিত মণিবাবু কোন কথা কহেন নাই; দেশপূজ্য স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে কোন সম্মান দেখান নাই। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ও যতটা সম্ভব নিজের সম্মান বাঁচাইয়া চলিবার জন্য কোনও প্রকারে মণিবাবুর সম্পর্কে যান নাই।

জমি-জমা সম্বন্ধে খাজনা দিবার জন্য দুই একবার কাছারীতে যাইবার আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় মণিবাবু কাছারীতে ছিলেন না;—গমস্তার নিকট খাজনা দিয়া চেক লইয়া আসিয়াছিলেন।

জমীদারের ডাক—তাহার উপর সদর কাছারীতে বসিয়া স্বয়ং জমীদার ডাক দিলে কোন্ প্রজা সে ডাক অগ্রাহ্য করিতে পারে? স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। কাছারী-ঘরে গমস্তা ও নায়েব বসিয়া যেখানে কাগজপত্র দেখিতেছিলেন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিমোহনবাবু কোথায়? আমায় এখানে এখনই আসিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "বসুন, তিনি ভিতরে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। আপনাকে ডাকা হয়েছে, তিন সন আপনার খাজনা বাকি প'ড়ে আছে; সেটা দিচ্ছেন না কেন?"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আমার খাজনা বাকি? তিন সনের?"

নায়েব মহাশয় ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "আকাশ হ'তে পড়্লেন যে! দেখ্বেন যেন মূর্চ্ছা না যান। খুব সোজা কথা! এর মধ্যে আপনাদের সংস্কৃত কথা কিছু নেই, যাতে অনুস্বার বিসর্গ যোগ হ'য়ে খুব শক্ত

হ’য়ে যেতে পারে। এই আপনার—জয়রাম স্মৃতিতীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামিত খাজনা গত তিন সন আদায় দেন নাই। সুদে হায়রাণ-খরচে মোট-জমায় আমাদের থোকে প্রাপ্য হচ্ছে,—তিনশত বিরাশী টাকা পনের আনা সাড়ে পনের গণ্ডা; তার পর হিসাব-আনা দয়া ক’রে হাতে তুলে যা দেন।”

“সে কি? আপনাদের সেরেস্তা দেখুন দেখি, আমার খাজনা আমি নিজে হাতে প্রত্যেক কিস্তিতে আদায় দিয়ে এসেছি। কোন গোল হবার কথা এর মধ্যে থাক্‌তে পারে না। চেক দাখিলা সবই আমার কাছে আছে। বিনা রসিদে ত খাজনা নেবার বা দেবার ব্যবস্থা স্বর্গীয় বাবুর হুকুম থাকে নি। তিন বছর হ’লে, তাঁর সময় এক বৎসর আর মণিবাবুর এই দু’বছর। তা কেমন ক’রে হ’তে পারে? নায়েব মশায়, আপনাদের ভুল হচ্ছে। বেশ ভাল ক’রে কাগজ-পত্র দেখুন। বোধ হয় জয়রাম ব’লে অপর কোন প্রজার খাজনা বাকি থাক্‌তে পারে, আমার খাজনা বাকি নাই; একেবারে, নিঃসন্দেহ হ’য়ে বল্‌তে পারি।”

“দেখুন মশায়, এটা জমীদারের কাছারী। এখানে ব’সে তাঁর কর্ম্মচারীদের ভুল হয়েছে এ কথা ব’লে বুকে ব’সে দাড়ি ওপ্‌ড়াবেন না। একটু সাবধান হ’য়ে কথা কইবেন!” বলিয়া ক্ষুদ্র নবাব-বিশেষ নায়েব মশায় নিজের শ্রীমুখের উপর গোঁফে ঘন ঘন মোচড় দিতে লাগিলেন। আর তাহা মা দুর্গার পায়ের নীচে অসুরের শ্রীমুখে যেমন ভাবে থাকে তেমনই ভাবে নিজের শ্রীমুখের উপরে গোঁফ জোড়া বসাইবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ও রোষকষায়িত লোচনে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইতে লাগিলেন।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার কি এতই ভুল হইবে? না—বোধ হয় আর কলির শেষ হইতে বাকি নাই, তাই এই সব বিভীষিকা দেখা যাইতেছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, "নারায়ণ, এ কাল মাহাত্ম্য হইতে রক্ষা কর। মধুসূদন, বিপদে উদ্ধার কর।"

তাহা শুনিয়া নায়েব মহাশয় বজ্রনির্ঘোষে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন ব্রাহ্মণ ব'লে এখনও চুপ ক'রে আছি, কিন্তু এ শাপাশাপি আর সহ্য কর্ত্তে পারি না। সোজা কথায় বলুন, খাজনা দেবেন কি না? রাজার খাজনা না দিয়ে কোনও বেটাই ফাঁকিতে জমি-জমা ভোগ কর্ত্তে পারে না --আমরা হচ্ছি যমের চিত্রগুপ্ত। আমাদের হাতেই এই সারা গ্রামখানির মরণ-বাঁচনের খাতা। বুঝলেন! খাজনা—চাই; খাজনা ফেলে দিয়ে উঠে যান। নয় ত উদয়-অস্ত ব'সে ব'সে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে—আপনার ঠাকুরদের ডাকুন।"

৪

দেশে আর সুবিচারের আশা নাই, ভদ্রলোকের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলা দায় হইয়া পড়িয়াছে। জমীদার মহাশয় নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া যাবতীয় লোকের ক্রটী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য চারিদিকে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। সংসারী মাত্রেরই জীবন-যাপন দোষ গুণের উপর। ঠক্ বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া গিয়াছে। গণ্যমান্য কেহই নাই। যাঁহাদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁহারা সকলেই প্রায় দেশের বাটীতে চাবি দিয়া বিদেশে গিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন।

আর যাঁহাদের অবস্থা তেমন নহে, তাঁহারা দিনের মধ্যে দশবার জমীদারের ডাকে হাজির দিতে বাধ্য হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিতেছেন, আর কতদিনে এই যম-যন্ত্রণা শেষ হইবে বলিয়া ভগবানের নিকট মৃত্যু কামনা করিতেছেন।

সকলেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু মানুষ যখন গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ঈশ্বর না মানিয়া চলে,—লঘু-গুরু বিচার না করিয়া চলে—তখন এ সীমা নির্দ্দেশ করিবার শক্তি সে হারাইয়া বসে। একরোখা জেদী মণিবাবুও মানুষ, তাঁহারই বা অন্যরূপ হইবে কেন? শত চেষ্টা করিয়াও দেশে ইস্কুল টিঁকিল না। তিন বৎসর কোনরূপে চলিয়া পরে ছাত্রের অভাবে ইস্কুল উঠিয়া গেল। তর্কতীর্থ মহাশয় মণিবাবুর বিশেষ সুনজরে পড়িয়াছিলেন; তাই সকল মাষ্টার-পণ্ডিতের বিদায় হইলেও তাঁহার কর্ম্মের শেষ হইয়াও বিদায় হইলেন না। মণিবাবুর সদর কাছারীতে পুরাতন হিসাব-পরীক্ষকের পদে বাহাল হইলেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাছারীতে হাজির হইয়া যথাকর্ত্তব্য সমাধা করিয়া পুরাতন কর্ম্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। পুরাতন সকল কর্ম্মচারীই একে একে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; মাত্র বৃদ্ধ দেওয়ান গোবিন্দ গাঙ্গুলী কোনও রূপে টিকিয়া গেলেন। শত চেষ্টা করিয়াও মণিবাবু বা তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার কোন ত্রুটীই বাহির করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু দেখা গেল, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের হিসাবের খাতায় একস্থানে স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—"আমার যাবতীয় সম্পত্তি আজ গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ-দত্ত টাকায় রক্ষা পাইল। আমি এ ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না। আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী এই নিঃস্বার্থ পরোপকারীর উপর আমার—বা আমার

উত্তরাধিকারীর কথনও কোনও কর্ত্তৃত্ব চলিবে না। তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন—আমার মহলের টাকা হইতে মাসিক একশত টাকা হিসাবে বেতন বা তঙ্কা লইতে পারিবেন। শ্রীশশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়। সন ১২৩০ সাল (আখেরী) ৩০শে চৈত্র।”

যখন তর্কতীর্থ ও জমীদার মহাশয় একপ্রাণ হইয়া জমীদারীর উন্নতি সাধনে যত্নবান্, সেই সময় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাকি খাজনা লইয়া এই প্রকার গোলযোগ হয়। বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেষ্টা ও যত্নে কোনরূপে বিবাদের প্রথম সূত্রেই তাহা মিটমাট হইয়া যায়। সেইদিন হইতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আর জমীদার-বাটীতে আসেন না। খাজনার টাকা কে দিল, কোথা হইতে আসিল, তাহা গাঙ্গুলী মহাশয় ও স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিল না। জমীদার মণিবাবুর নিকট প্রকাশ হইল, গাঙ্গুলী মহাশয়ের মারফতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাল-বকেয়া নূতন চেক লইয়া গিয়াছেন। তর্কতীর্থ মহাশয় মণিবাবুকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—“দাদার এমন অবস্থা নয় যে, এত টাকা একসঙ্গে বা’র করতে পারেন, নিশ্চয়ই এর ভিতর কোন শাসাল চাল-বাজ লোক আছে। বোধ হয় ঘর-শত্রু বিভীষণ—এই বুড়ো গাঙ্গুলীই টাকা দিয়ে ভিতরে ভিতরে কিছু ব্যবস্থা করেছেন। তা ছাড়া আমি চিরদিনই জানি যে, এই গাঙ্গুলীর বড় ইচ্ছা দাদার পরমাসুন্দরী কন্যা মনোরমাকে বেটার-বৌ ক’রে ঘরে নিয়ে যান। তার উপর যখন উনি এখন হ’তে দাদার অভাব অভিযোগে দাঁড়িয়ে মন কিন্‌তে সুরু করেছেন, তখন আর দাদার কন্যাদায় হ’তে নিষ্কৃতি পেতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না। দাদার চিরদিনের ধারণা যার মধ্যে—যার ব্যবহারে আচার, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন প্রভৃতি নয়টা গুণ পাওয়া

যাবে—তিনিই কুলীন হ'তে পারেন। বংশগত কৌলীন্যই যে তিনি মেনে চল্‌বেন তা বোধ হয় না। বিশেষ, অভাবেই স্বভাব নষ্ট নয়। এমন অবস্থায় মানুষে কি ক'রে এখনও এসব জেদ বজায় রেখে চলেছে, সেটা ভাব্‌বার বিষয়।"

মণিবাবু হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম অভাবে পড়েছেন?"

তর্কতীর্থ মহাশয় ব্যঙ্গের হাসিতে মুখচোখ উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, "তার সম্যক্‌ বর্ণনা করা একেবারে সম্ভব নয়। বিশেষ আমাদের বড় বৌঠান যে চাপা লোক, তাতে বাহিরের লোকে সহজে বুঝে, এমন সব ব্যাপার এখনও হ'তে দেন নাই। কিন্তু আর চাপা থাকে না। আজই না হয় আমি পৃথক্‌ হ'য়ে প্রাচীরের আড়ালে গেছি। চিরদিন ত আর এমন থাকি নি। চালে খড় নাই, ঘরে পেটভরে খাবার ভাত নাই, পরণের কাপড়-সব একখানা ক'রে, তাও শত-জীর্ণ দশায়—কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ কচ্ছেন। মনোরমা এদিকে তের বৎসর পার হ'য়ে যেতে বসেছে, বিয়ের কোন কথাই নাই। এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে পূরে রেখে আমার গুণধর দাদা ব্যোমভোলা হ'য়ে ব'সে আছেন। আজকাল আর একেবারে বাড়ীর বা'র হন না। এর চেয়ে আর কি দুর্গতি চান?"

"কেন, তাঁর ত শিষ্য যজমান অনেক ছিল?"

"মশায়, আর সে দুঃখের কথা বলেন কেন? চিরদিন আমার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এসেছেন; এখন ত আর আমি নেই, যে সে সব বজায় থাক্‌বে। না ডাক্‌লে দাদা কারও বাড়ী যান না। এখন কি আর সে যুগ আছে যে, বাম্‌নাই ক'রে গোঁ ধ'রে ব'সে থাক্‌বেন। ডাকের আগে আমি সকলের খোঁজ নিয়ে—সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে

সব কাজ আমিই কচ্ছি। আমি এমন বান্দা নই যে, আমার পরিশ্রমের ধন বিলিয়ে দেব,— তাঁর মুখে তুলে দিতে যাব! পার, খেটে খাও। আমার ত এই কথা, তাতে যত কিছু পাপ হয় হবে। আমার খাটুনির ধন আমি কেন মাথায় ব'য়ে অন্যকে দেব? আর কেই বা এমন ক'রে দেয়?"

"আচ্ছা, আপনার ভাইঝির এত বয়স হ'য়ে গেল, বিয়ে না দেওয়া ত খুব দোষের হচ্ছে।"

"দোষের ব'লে দোষের!—সাত পুরুষ নরকে যেতে বসেছে। একে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তাতে পরিণত যৌবনা, নিটোল সুস্থ দেহ। আর বলেন কেন! যা হবার নয় তাই হ'তে বসেছে। সমাজের তেমন কড়া শাসন থাকলে দাদাকে আমার এতদিন একঘরে হ'য়ে থাকতে হ'ত। কেবল তিনি আমার দাদা, আর এদিকে আপনি আমায় যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখেন—তাই গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ কিছু ক'রে উঠতে সাহস পান নি, তা না হ'লে—"

"সুন্দরী মেয়ের আবার বিয়ের অভাব! একটু চেষ্টা করলেই হ'তে পারে। আপনারও ত উচিত একটু দেখে-শুনে সব ঠিক ক'রে দেওয়া।"

"উচিত ত বটে, কিন্তু আমার কথার এখন সব অন্য অর্থ হ'তে বসেছে। আমি কি করি বলুন। আমি যে একেবারেই চেষ্টা করি নি তা নয়; আমার কথা শুনেন কই? দাদা যদি আমার কথা শুনতেন, তা হ'লে মনোরমা এতদিনে রাজরাণী হ'য়ে যেত।"

"এমন সম্বন্ধ পেয়েও তিনি সেটা হাতছাড়া ক'রে দিলেন—বল্লেন কি? কোথায় এমন পাত্রটী পেয়েছিলেন?"

"আপনার কাছে বল্‌তে আর বাধা কি। তবে আপনি দয়া ক'রে মনে কিছু করবেন না। একদিন কথাচ্ছলে আমি বৌঠানের কাছে বলেছিলাম যে, যদি তোমাদের মত হয়, তা হ'লে আমি মনোরমার সঙ্গে এই—"

"আপনি এত সঙ্কোচ বোধ করচেন কেন? আইবুড়ো ছেলে মেয়েদের বিবাহের কথা এমন কত জায়গায় হয়। কথা হলেই যে তা অমনি বাগ্‌দান হ'য়ে যায়, এমন ত আর শাস্ত্রে লেখে না।"

"তা ত বটেই। তবে আপনি যখন সাহস দিচ্ছেন, তখন যত বড় ধৃষ্টতা হ'ক্‌ না কেন,—সেটা নিশ্চয়ই মাপ কর্‌বেন।"

"অমন কথা বল্‌বেন না। আপনি আমার পূজ্য, মান্য, হিতাকাঙ্ক্ষী; আপনি যাই কেন বলুন না, আপনার উপর আমার কখনও রাগ হয় নি, হতেও পারে না।"

"দেখুন, আমি আপনার মুখ থেকে কথা নেবার আগেই বলেছিলাম, মেয়ে দেখে মণিবাবুর যদি পছন্দ হয়, তবে অমন ঘরে অমন বরে মেয়ে দিতে অমত ক'রো না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ। তাই তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে আমায় যা নয় তাই শুনিয়ে দিলেন। দাদা বল্‌লেন 'ধন দেখে মেয়েকে আমি আমাদের চেয়ে ছোট ঘরে কোন মতে দিতে পারি না।' আর বৌঠান বল্‌লেন, 'যে লোক হয়কে নয় করতে পারে, যার সঙ্গে রাজা প্রজা সম্বন্ধ—তার ঘরে কি মেয়ে দিতে আছে। আজ যাকে ঘরের বৌ ব'লে বরণ ক'রে তুলবে, কাল হয় ত পায়ে ঠেলে দেবে; নয় ত আজ যাকে বৌ ব'লে নিয়ে যাবে, কাল তাকে বাঁদির মত দেখবে। ঠাকুরপোর যেমন কথা! যা মুখে আনতে নেই এ তাই।' যাদের এত অহঙ্কার, এত বড় তেজ, তাদের কথায় কি মানুষে থাকে মশায়।"

"আমি যে বিয়ে করবো না, এটা ত আপনি বরাবরই শুনে আস্‌ছেন, তবে আপনার এ বিশ্বাস কেমন ক'রে হ'ল যে আপনার ভাইঝিকে দেখেই আমার বিয়ের মত হ'তে পারে?"

"মানুষের যে ভুল হয় না, মণিবাবু, তা আমি আপনাকে বলছি না। তবে অনেক সময়ই মানুষের অনেক কথা অসম্ভব কল্পনা হলেও তা কাজে হ'তে দেখা যায়। আমার এখনও বিশ্বাস—এমন রূপবান্, গুণবান্, উদার-হৃদয়—আপনি কখনই সে গুণের বা রূপের আদর কর্‌বেন না তা হতেই পারে না। তা ছাড়া আমার ভাইঝি, আমার স্নেহের চক্ষে খুব সুন্দরী—ঠিক মা লক্ষ্মীর মত হলেও যে আপনার চক্ষে খারাপ দেখাবে বা আপনার পছন্দ হবে না, এও ত আপনি নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারেন না। সহস্রের মধ্যে এমন মেয়ে একটা দেখা যায় না; এ কথা আমি খুব বড় গলা ক'রে চির-দিন বল্‌বো। দাদার সঙ্গে যতই শত্রুতা হ'ক্ না—এটা আমি বেশ বল্‌তে পারি—মনোরমার মত মেয়ে আজ পর্য্যন্ত কখনও দেখি নি। সে দেবী-প্রতিমার চেয়েও সুন্দরী, এমন ভাস্কর নাই যে তেমন মূর্ত্তি গড়তে পারে।"

৫

তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট মনোরমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া মণিবাবু মনে মনে ধারণা করিলেন, এ কত বড় সুন্দরী, যাহার মূর্ত্তি ভাস্করেও গড়িতে পারে না, তাহাকে দেখিতেই হইবে। তাহাকে না দেখিলে পৃথিবীতে আসিয়া একটা মস্ত বড় কাজ বাকি থাকিয়া যাইবে। ছলে হউক, বলে হউক, একবার দেখিতেই হইবে। আবার তখনই মনে পড়িয়া গেল এই ব্রাহ্মণের কত বড় বংশ-গৌরব যাহার দম্ভের শিখরে বসিয়া আমায় সব বিষয়ে ছোট করিয়া দেখিতে সাহস করে, বা মুখে

তাহা উচ্চারণ করিতে পারে। আমি একদিন দেখাইব, যাহার অর্থ আছে তাহার সবই আছে। তাহার উপর যাহার অর্থ ও বুদ্ধি দুই-ই আছে, সে তাহাদের সাহায্যে বংশমর্য্যাদাও ফিরাইয়া আনিতে পারে,—সে দ্বিতীয় কৌলীন্য স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়া সমাজের শীর্ষে বসিতে পারে। দেশ বিদেশের বড় বড় কুলীন ও পণ্ডিত আনাইয়া যাহাতে এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, সেইদিন হইতেই তাহার জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। আর কেমন করিয়া এই দর্পী ব্রাহ্মণ-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনপূর্ব্বক, তর্কতীর্থের সাহায্যে মনোরমাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

পল্লীগ্রাম হইলেও এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের এমনই বিশেষত্ব ছিল যে, কাহারও বাড়ীতে বিশেষ কার্য্য না পড়িলে, বাড়ীর মেয়েরা কোথাও যাইতেন না। অনেকদিন হইতেই এইরূপ ব্যবহারের ফলে, শেষে এমনই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, বিশেষ আত্মীয়ের বাড়ী ব্যতীত আর কাহারও বাড়ীতে মেয়েদের যাতায়াত ছিল না; তাও বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে। তাহার উপর আবার জমীদারের সহিত মনোমালিন্য হওয়ার পর হইতেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, শিষ্য যজমান ত্যাগ, সাংসারিক নানা অভাব অভিযোগ ও শেষে কাছারী-বাড়ীতে বিশেষরূপ অপমানিত হওয়া অবধি স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আর পূর্ব্বের মত কাহারও সহিত মিশিতে পারিতেন না। নিজের বাড়ীর মধ্যেই নিজের গণ্ডীতে বসিয়াই দিবারাত্র কাটাইতেন। বাহিরের কার্য্যে, বাহিরের লোকজনের ব্যবহারে, যেন একটা তিক্ত ব্যবহার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়াই মনে করিতেন। এই সব দুশ্চিন্তায় তাঁহার সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর যেন চিন্তার গাঢ় কালিমা রেখা সর্ব্বদাই দেখা যাইত।

কন্যাদায় বুকে করিয়া কয়দিনই বা এ ভাবে দিন কাটাইবেন ; যেমন করিয়া হউক, এ দায় হইতে উদ্ধার হইতে হইবেই, মনে মনে যে এ সব চিন্তা করেন নাই, তাহা নহে। আরও মনে মনে ভাবিতেছিলেন, নিজের ভাই—মায়ের পেটের সহোদর ভাই যখন জমীদারের সঙ্গে যোগ দিয়া এমনভাবে তাঁহাকে বিপন্ন করিতেছে, তখন আর চেষ্টা করিয়া কি ফল হইবে! সে বাধা দিবেই। কিন্তু যখন ভবিতব্য নিজে আসিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে একযোগ হইয়া আমায় উদ্বুদ্ধ করিবেন তখন শত বিঘ্নরাজ আসিয়াও আর বিঘ্ন করিতে পারিবেন না। তাই এই প্রাক্তনবাদী স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সেই অনির্দ্দেশ্য শুভদিনের অপেক্ষায় বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন।

যাহার জীবনই প্রকাণ্ড বিঘ্নরাজের রাজত্ব, তাহার ভাগ্যে কি কখনও প্রাক্তনের সাফল্য আসিতে পারে? বিঘ্ন যদি চিরদিনই হতাদর হইয়া বিমুখ হইত, তবে আবহমান কাল সে কি করিয়া বাঁচিয়া আছে? কোথাও সে হতাদর—বিপদ্; আবার কোথাও সে সম্পদ্ অজ্ঞাতে সম্পদের কার্য্য করিয়া আসিতেছে বলিয়াই এখন রহিয়াছে!

দেশ বিদেশের কুলীন ও পণ্ডিত আসিয়া একপক্ষ কাল জমীদার-বাড়ীতে রাজভোগ ও রাজসম্মান পাইয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গেলেন যে, যাঁহার এত বড় কীর্ত্তি, তিনিই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, তিনিই কুলীন-শ্রেষ্ঠ—তিনিই সমগ্র বঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজের মুকুটমণি।

কেবলমাত্র একজন তাহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়াই এই কয়দিন গ্রামে থাকেন নাই। তিনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ জয়রাম স্মৃতিতীর্থ।

বহু সন্ধান করিয়াও স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মণিবাবু ইহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াই সেই বিরাট্ সভাগৃহে বলিয়াছিলেন, "দেখুন আমার মনে হচ্ছে, আমার এই কৌলীন্যপদ লাভ, আর বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ এক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তেত্রিশ কোটী দেবতা ঋষি মিলে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার কল্লেও যতক্ষণ না তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করেছিলেন, ততক্ষণ যেমন বিশ্বামিত্রের নিজের তৃপ্তি আসেনি, আমারও মনে হচ্ছে তাই। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যতক্ষণ না আমাকে কুলীন ব'লে স্বীকার কচ্ছেন, ততক্ষণ যেন আমার মনঃপুত হচ্ছে না। তিনি হচ্ছেন আমাদের দেশের গৌরব, তাঁকে বাদ দিয়ে আমার এ যজ্ঞ পূর্ণ হচ্ছে মনে কর্‌তেও আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।"

তর্কতীর্থ মহাশয় সেই বিরাট্ সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া সেই সময়ে বলিলেন, "আমার বংশের সঙ্গে আপনার বংশের আদান-প্রদানে সে তৃপ্তি আস্‌বে। আমি স্বীকার কচ্ছি, আপনাকে আমাদের বংশের কন্যাদান কর্‌বো। আর সে সভায় এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ও কুলীন সন্তানের যথাসম্ভব মর্য্যাদা উভয় পক্ষ হইতেই দেওয়া হবে। আর এঁরা তা কখনই প্রত্যাখ্যান কর্‌বেন না।"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দেশে আসিয়া এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কেমন করিয়া এই সব চক্রান্ত হইতে নিজের বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কি কেনা-কুলীনের সম্মানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কন্যাদান করিতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। যে দেশ এমন চক্রান্ত করিয়া জাতিনাশ করিতে পারে, ভাই ভাইএর সঙ্গে শত্রুতা করে, সে দেশ ত্যাগ করাই সঙ্গত। তিনি আবার

বাটীর বাহির হইয়া আবাসযোগ্য স্থান অন্বেষণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

সেইদিনই অপরাহ্নে মণিবাবু তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিলেন ও অন্তরাল হইতে মনোরমাকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই সৌন্দর্য্য সুষমা—এ নারী-রত্ন যদি আমার অঙ্কশায়িনী করিতে না পারি, তবে আমার জীবনই বৃথা। ধনজন জীবন মরণ পণ করিয়া এ রত্ন বক্ষে ধারণ করিবই।

৬

একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় মাসাবধি চলিয়া গেল, তবুও স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দেশে ফিরিতে পারিলেন না। নানা দেশ ঘুরিয়া কোথাও পাত্র অন্বেষণ করিতে পারিলেন না। ঘর পান ত বর পান না, বর পান ত ঘর পান না। তাহার উপর বিনা অর্থে কিরূপে এ কার্য্য সমাধা হইবে। বাস ত্যাগ করিবারও ইচ্ছা আছে, মধ্যে মধ্যে সে চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু নিয়তি এমনি বিরূপ, কোন দিকেরই সুবিধা হইতেছে না, শত চেষ্টাও কার্য্যকারী হইতেছে না। তবুও চেষ্টার অন্ত নাই। জীবন মরণ পণ করিয়া অবশেষে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া পাত্র অন্বেষণ করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে পাত্র অন্বেষণ করিয়া বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া দেশে ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ভাবী জামাতার বাড়ীতেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে সংসারে দারুণ অভাব, তাহার উপর অভিভাবকহীন অবস্থায় স্মৃতিতীর্থ-গৃহিণী বিপদে পড়িলেন। বয়স্থা মনোরমা ও শিশু কমলা-

রঞ্জনকে লইয়া আর দিন চালান ভার হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর মূল্যবান্ জিনিস যাহা কিছু ছিল, পূর্ব্বেই একে একে সব বন্ধক পড়িয়াছিল। শেষে নিত্য ব্যবহারের অতিরিক্ত পিতল কাঁসা পর্য্যন্ত একে একে কতক বন্ধক বা কতক বিক্রয় করিয়া দিন চলিতে লাগিল। কিন্তু এভাবেই আর কয়দিন চলিতে পারে!

মনোরমা মার সঙ্গে দিবারাত্রি ছায়ার মত ফিরিয়া দেখে, কখন কি ভাবে তিনি দিন কাটাইতেছেন। কখনও বা ছোট ভাইটীকে সঙ্গে লইয়া এক আধ বার ভিতর বাড়ীতে খুড়ীমার কাছে গিয়া বসে। সে একদিন সেখানে গিয়া শুনিল, তাহার পূজ্যপাদ খুড়া মহাশয় ঘরের মধ্যে বসিয়া তাহার কাকীমার সহিত তাহাদেরই সম্বন্ধে কথা কহিতে-ছেন। মনোরমা বাহির হইতে শুনিতে পাইল, তাহার কাকা বিশেষ কর্কশকণ্ঠে তাহার কাকীমাকে বলিতেছে "তুমি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছ, নতুবা চলে কি ক'রে?"

মনোরমার কাকীমা কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি তোমার দিব্য দিয়ে এইমাত্র যা বল্‌লাম, তাতেও যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি নাচার। আমি কতবার কত সময়ে কিছু না কিছু দিতে গিয়েছি বটে, কিন্তু দিদি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন—'স্বামীর অজানায় কোন কাজ ক'রো না বোন। স্বামীর মনের অনুরূপ না হ'য়ে অন্যরূপ হ'য়ো না। তাতে পাপ আছে।' আর তুমি কি না বল্‌ছ আমিই ওদের চালিয়ে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে দিদির ভিতরে ভিতরে যোগ আছে। আমার দান নিলে ত আমি বাঁচতুম। তাতে যে তোমার পাপের বোঝা কমে যেত।"

"যত বড় মুখ তত বড় কথা। তোমার স্পর্দ্ধা বড় বেড়ে গেছে। আমি

কি অন্যায় করেছি—আমি কি পাপ করেছি। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই আছেই। এ ত আর আমি নূতন করিনি যে, পাপের বোঝা আমারই ঘাড়ে চাপ্‌বে। বিশ্বদুনিয়ায় যা চলেছে, আমি তা ছাড়া কি করেছি—যাতে তোমার এত বড় কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধা হ'ল। তোমার মনের কথা যদি আজ খুলে না বল, তবে তুমি তোমার ছেলের মাথা খাবে।"

"ষাট ষাট! ও কথা তুমি মুখে এনো না। তুমি কি ছিলে আর কি হ'লে। নিজের ছেলে, তার অকল্যাণের কথা মুখে আন্‌তে তোমার প্রাণ কাঁদলো না। যা বল্‌বে আমায় বল না। আমার যা ধারণা, আমি ত তা চিরদিনই তোমায় ব'লে এসেছি, আজও বল্‌ছি।" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কোলের উপর শায়িত একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা সরমার মুখচুম্বন করিলেন। তার পর গলা ঝাড়িয়া নাক মুখ মুছিয়া বলিতে লাগিলেন—"দেখ, যা করেছ তার আর উপায় নাই। কিন্তু এর বেশী অন্যায়ে আর যেও না। পরের মন্ত্রণায় আপনার ভাইয়ের আর সর্ব্বনাশ ক'রো না। একে তিনি বিদেশে, তার উপর সংসারের অবস্থা ত এই, দিন চলা ভার। থালা ঘটি বাটি বেচে দিদি না খেয়ে মনোরমাকে একবেলা খাওয়াচ্ছেন, আর ছেলেটাকে কোন রকমে দু'বেলা বাসি পান্তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তোমার নিজের ভাইপো, ভাইঝি, ভাজ, তোমার উচিত তাদের দেখা। তুমি তা না দেখে তাদের উপর কি দুষমণের ব্যবহার না কচ্ছ? জমীদার তোমার কে যে, তার সুরে সুর মিশিয়ে তোমায় এক হ'তে হবে। নিজের দিকে চেয়ে একবার দেখ। কঠিন হ'য়ো না। একে ত ঐ হতভাগার মন্ত্রণায় প'ড়ে তুমিই ওদের মান-সম্ভ্রম সব নষ্ট ক'রে দিয়েছ, তার উপর আইবুড়ো মেয়ের উপর এসব মন্ত্রণা—ধর্ম্মে সইবে না।"

"তোমার উপদেশ নিয়ে আমায় চল্‌তে হবে নাকি? আমি যা বল্‌ছি, তুমি তা শুন্‌বে কি না, আমি তা স্পষ্ট শুন্‌তে চাই।"

"আমার ভাল কথা যদি তোমার বিষ লাগে, তবে আমি আর কোন কথা বল্‌বো না। কিন্তু আমার দ্বারা এ সব কোন কাজ হবে না। তাতে আমায় মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল।"

"এটা কি এমন মন্দ কাজ যে, তুমি পার্‌বে না। ভূ ভারতের সকল ব্রাহ্মণ-সমাজ এসে স্বীকার ক'রে গেল মণিবাবু ব্রাহ্মণ-প্রধান—কুলীন-শ্রেষ্ঠ। আর এর চেয়ে ভাল ঘর বর কোথায় পাবে যে, সেইখানে মেয়ে দেবে। তুমি বাধা দিও না। আমি বৌদিদিকে বুঝিয়ে নিশ্চয় মত করাব। তিনি তোমার চেয়ে বোঝেন ভাল। তিনি নিশ্চয় মত দেবেন। আমি ওবাড়ী যাবার আগে মণিবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক ক'রে আসি।"

"ঠিক কর্‌বে কি বল? তুমি পাগল হ'লে না কি! বড়ঠাকুর বিদেশে—তিনি আসুন, তার পর তাঁকে ব'লে ক'য়ে মনোরমার বিয়ের কথা ক'য়ো। তা না হ'লে, কি জোর ক'রে মেয়ের বিয়ে দেবে না কি? যদি এমন কর, তা হ'লে আমি সব গোল ক'রে দেব ব'লে রাখ্‌ছি।"

"দেখ, বাড়াবাড়ি ক'রো না, সকলেরই একটা সীমা আছে। জমীদার জামাই হ'লে আর খেটে খেতে হবে না। রাজার হালে দিন চ'লে যাবে। আর দাদারও অবস্থা ফিরে যাবে। জমি-জমা যা কিছু বাকি-খাজনার জন্য নীলামে চড়েছে, তাও সব ফিরে আস্‌বে। তুমি চুপ করে দেখ, কেমন কৌশলে সব কাজ সেরে ফেলি। আজ মণিবাবু আমাদের বাড়ী এসে মেয়ে দেখে যাবেন। তুমি মনোরমাকে ডেকে এনে আমাদের ঘরে বসিয়ে রেখো। তারপর যা কর্‌তে হবে, আমি সব ক'রে নেব।"

এই বলিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় ঘরের বাহির হইবার উপক্রম করিতেই

মনোরমা বাহির হইতে—“কাকীমা, কাকীমা” বলিয়া ডাকিয়া ঘরের ভিতরের দিকে আসিতে প্রবৃত্ত হইল।

তর্কতীর্থ মহাশয় বাহিরে আসিয়াই বলিলেন—“আয় মা মনোরমা। আমি বাইরে যাচ্ছি, তোরা সব ঘরে ব'সে কথাবার্ত্তা ক'।” বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

মনোরমা ভিতরে আসিয়া কাকীমার গলা জড়াইয়া তাহার কোলের নিকট বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, “কাকীমা, এমন মুখ ভার ক'রে ব'সে রয়েছ—কেন মা, তোমায় বুঝি কাকা বকেছে।”

কাকীমার এতক্ষণের অতিকষ্টে রুদ্ধ অশ্রু আর কোন বাধা না মানিয়া তাঁহার স্নেহপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয়কে প্লাবিত করিয়া মনোরমার মুখ কপোল ভাসাইয়া দিতে লাগিল। আর মনোরমা সেই প্রবাহিত অশ্রুর স্রোত বাড়াইতেই যেন নিজের অশ্রুর উৎস-মুখ খুলিয়া দিল।

৭

ফাল্গুনের প্রকৃতির নবজাগরণের সঙ্গে যেমন তাহার বাহ্য প্রকৃতির নব বেশ-ভূষা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনই ভাবে নিজের অন্তর নব-ভাবে ও বাহ্য নব বেশ-ভূষায় আবৃত করিয়া, মণিবাবু তর্কতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের সংবাদ ডাকিয়া হাঁকিয়া প্রচার করিবার পূর্ব্বেই বসন্ত মারুতের সঙ্গে তাঁহার গাত্রের কৃত্রিম সৌরভ এই দুই ব্রাহ্মণ-পরিবারের নাসিকা রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মনের মধ্যে জাগাইয়া দিল—শ্রীল শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাবি-পত্নী শ্রীমতী মনোরমা দেবীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

একের যাহাতে আনন্দ—অন্যের তাহাতেই অতি দুঃখ, বিশ্বের নিয়মই এই। খাদ্য-খাদকের মত সম্পর্কেই সারা জগৎ চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে। সংসারের নিয়মই যখন এই সুরে বাঁধা রহিয়াছে, তখন আজই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? তর্কতীর্থ মহাশয় বিশেষ অভ্যর্থনা সহকারে মণিবাবুকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। নানা কথা বার্ত্তার পর তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন, "আমার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল ব'লে আজ আমি আর কাছারীতে যেতে পারি নি। সংবাদ দিই দিই করেও এখন পর্য্যন্ত সংবাদ না দেওয়াতে বিশেষ দোষ হ'য়ে গেছে, তার জন্য মনে কিছু কর্‌বেন না।"

মণিবাবু হাসিতে হাসিতে লজ্জা রাগ রক্তিম মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ, এতে আর দোষ হয়েছে কি? বিশেষ আপনারা যখন আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়, তখন আমার কাজ যা কিছু সবই আপনাদের নিজের। আর এটাও ঠিক যে, আপনাদের যা কিছু অভাব অভিযোগ, দায় দফা সবই আমারও নিজের।"

"তা ত বটেই, আপনার—"

"তর্কতীর্থ মহাশয়, এখনও আমাকে স্নেহের চক্ষে না দেখে—অতি সম্মানীর মত আপনি আপনার করেন, তা হ'লে আমি কাদের কাছে স্নেহের দাবী কর্‌বো—কাদের কাছে পুত্রের সমান আদর পাব?"

"তা ত বটেই বাবাজী, তবে কি না চিরকালের অভ্যাস তাতেই প্রথম প্রথম একটু বাধ-বাধ মনে হচ্ছে। তা যখন জগদম্বার ইচ্ছেয় চার হাতে দু'হাত হবে, তখন সেই মত সব মেনে চল্‌তে হবে বৈ কি। এখন একটু মিষ্টি মুখ কর্‌তে হবে বাবাজি! আমি একবার
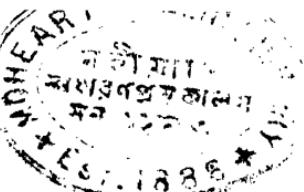
ওবাড়ী হ'তে আস্‌চি। দেখি মেয়েগুলো সব কতদূর কি করলে। ওদের আর সাথ হয় না। ঘরের ছেলে মণিমোহন ওর জন্য আবার সাথ-অসাথ কি আছে, এত ক'রে বুঝিয়েও পারলাম না। কোথারে সরমা, তোদের সব কি হ'ল। তোর দিদিকেই সব খাবার টাবার নিয়ে আস্‌তে বল্ না। ও সরমা, তোরা সব কোথা গেলি রে” বলিতে বলিতে, তর্কতীর্থ মহাশয় জ্যেষ্ঠের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। বাড়ীর মধ্যে যাইয়া “ও মনোরমা,—ও মনো—ও মনো মা, কোথা গেলি গো” বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

অনেক ডাকাডাকির পর মনোরমা একখানি শতজীর্ণ বস্ত্রে আপনার লজ্জাকে কোনরূপে আবৃত করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার রুক্ষ কেশ, রক্তজবার মত চক্ষু, ক্রন্দনোন্মুখ মুখ দেখিয়া, তর্কতীর্থ মহাশয় অতি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি হয়েছে মনো! এমন ক'রে রয়েছিস্ কেন? অসুখ করেছে বুঝি? তোর মা কোথায়? এরা সব গেলো কোথায়? আর কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছি না।”

“সরমা ঘুমিয়ে পড়েছে। মা, কাকীমা, কমলারঞ্জন গা ধুতে গেছে। আমার বড্ড জ্বর এসেছে! আমি দাঁড়াতে পার্‌চি না কাকা-মশায়।” বলিয়াই আবার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আর তর্কতীর্থ মহাশয় আকাশ পাতাল ভাবিবার জন্যই যেন উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণই এ ভাবে তাঁহার কাটিয়া গেল। কমলারঞ্জন তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া যখন বলিয়া উঠিল—“কাকা-মশায় উঠে বসুন।” তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

এদিকে মনোরমার কাকীমা তাঁহাদের বাড়ী প্রবেশ করিয়াই

সম্মুখের দ্বারের উপর মণিবাবুকে দেখিতে পাইয়া শশব্যস্তে ফিরিয়া আসিয়া মনোরমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল, তাহার স্বামী উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। আর কমলারঞ্জন বলিতেছে, "কাকা-মশায় উঠে বসুন।"

মনোরমার কাকীমা, শশব্যস্তে বড় বৌ-ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া বলিল, "জমীদারবাবু আমাদের ঘরে ব'সে আছেন। ওঁকে বাড়ী যেতে বল। আমি কাপড় ছাড়্তে পার্ছি না!"

বড় বৌ-ঠাকুরাণী বলিলেন, "ভদ্রলোক বাড়ী এসে ব'সে আছেন, তুমি সেখানে যাও ঠাকুরপো, তার খাতির করগে। তাঁকে একা রেখে তোমার এখানে আসা কি ভাল হয়েছে। শীঘ্র যাও। ছোট বৌ সাম্‌নে প'ড়ে গেছে, তাই এমন ক'রে চলে এলো। তিনি হয় ত কি মনে কর্‌বেন।"

তর্কতীর্থ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "মনে আবার কি কর্‌বেন। আজ বই কাল জামাই ছেলে হবে। স্নেহের ধন তাদের কাছে আবার লজ্জা কি? তোমাদের সবটাই বাড়াবাড়ি।"

মনোরমার মা এই কথা শুনিয়াই একটু পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যাঁর মেয়ে তাঁর মত না নিয়েই দেখ্‌ছি তুমি একেবারে সব ঠিক ক'রে ফেলেছ। এর পরিণাম কি তা ত ভেবে দেখচ না। তাঁকে আস্‌তে দাও, তার পর তিনি যা বলবেন তাই হবে।"

তর্কতীর্থ মহাশয় নিজের গলার সুর বেশ উচ্চে তুলিয়া মণিবাবু পাশের বাড়ীতে শুনিতে পান, এমনি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি মত দিলে কি দাদা অমত কর্ত্তে পার্‌বেন। চির-দিন দেখে আস্‌ছি তোমার কথায় দাদা উঠেন বসেন আর আজ

তুমি বল্‌চ কি না তাঁর মত না পেলে কিছু হবার নয়। কেন, বৌঠান আমাকে ঘাঁট্‌কাবে? তবে আমি যে বড় মুখ ক'রে মণিবাবুকে ব'লে ক'য়ে মেয়ে দেখাতে ঘরে এনেছি,—তিনি যে দয়া ক'রে এসেছেন, তার ফল কি অন্তরূপ হবে? দেখ, আমার অপমান করা যদি তোমার মত হয়, তবে তাহাই কর। কিন্তু জেনো এতে শুধু আমার অপমান নয়, মণিবাবুও এতে ক্ষুব্ধ হ'তে পারেন। বিবেচনা ক'রে দেখ, আইবুড়ো মেয়ে দেখাতে এমন কিছু দোষ হয় না। এমন কতবার মেয়ে দেখালে তবে সব মেয়ের বিয়ে হয়। মেয়ে দেখে পছন্দ হ'লে তবে ত অপর কথা। বেশী দেরী ক'রো না ;—মনোরমাকে ওবাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। খাবার দাবার যা হ'ক্ কিছু নিয়ে মনোরমা মণিবাবুকে দিয়ে আসুক। গাঁয়ের মানুষ, তায় জমীদার, তার সামনে আর মেয়ে পাঠাতে বেশী কিছু সাজসজ্জাও কর্‌তে হবে না। যাও, সব তৎপর হও। আমি এখনি আস্‌চি।"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, পরে দুই যায়ে মন্ত্রণা ঠিক করিলেন। পাগলের সঙ্গে পাগলামী করা অপেক্ষা একটু চতুরতা ব্যতীত এক্ষেত্রে উপায় নাই। তখন স্থির হইল শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে বর কনের দেখা সাক্ষাৎ করা এ বাড়ীর প্রথা নয়। তার উপর জ্বর গায়ে মেয়ে দেখাইতে নাই। দু' পাঁচদিন পরে তখন একটা ভাল দিন দেখিয়া মেয়ে দেখান হইবে।

তর্কতীর্থ মহাশয় মণিবাবুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সব কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। নানা প্রকারেও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন অগত্যা মণিবাবুকে এই সব কথা বলিতে বাধ্য হইলেন।

মণিবাবু আশা ভেঙ্গে নিরুৎসাহ না হইয়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "দেখুন তর্কতীর্থ মহাশয়, আমি যে কাজে হাত দিই, তার শেষ না করা আমার কোষ্ঠীতে লেখে নাই। যে কাজে যত বাধা পাই, সে কাজ করতে আমার ততই উৎসাহ হয়।"

নদীর জল যেখানে যত বাধা পায় সে ততই আঁকিয়া বাঁকিয়া নিম্নের দিকে যায়। আর তাহার শেষ গন্তব্যস্থান-সাগরে পৌঁছাইবেই। প্রকৃতির চিরদিনের এই নিয়মের সঙ্গে জড়-মানবেরও চরিত্র এই ভাবেই আবদ্ধ। মণিবাবু বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার দুইজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর উপর ভার দিলেন, যে কোনও উপায়ে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কোথায় আছেন এবং কি ভাবে আছেন তাহার সন্ধান আনিতেই হইবে।

মাসাবধি কাল চেষ্টার পর তাহারা সংবাদ আনিল, বিক্রমপুরে ভাবী জামাতার বাড়ীতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এতদিন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থান করিতেছিলেন। এখন জীবনের আশা হইয়াছে, দু' দশ দিন মধ্যে আসিয়া বাড়ীর সকলকেই সেখানে লইয়া যাইবেন।

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় মণিবাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন যে, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দেশে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার সহিত মনোরমার বিবাহ দিতে হইবে। আর ইহার বিনিময়ে তর্কতীর্থ মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা লইবেন।

দেশের লোকের নিকট নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ও লোকতঃ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য চক্ষুলজ্জার ভয়ে তর্কতীর্থ মহাশয় কলিকাতার লোক-রব্দের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা করিতে মণিবাবুকে অনুরোধ করিলেন।

* * * * *

দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় ও মনোরমার মাতাকে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অসুখের সংবাদ এবং বিক্রমপুরে মনোরমার বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়াছে, তাহা জানাইলেন। আর ইহাও বলিতে ভুলিলেন না যে, স্মৃতি-তীর্থ মহাশয়ের অসুখ খুব বেশী,—সেই দিনই যাত্রা করিতে হইবে। নতুবা দেখা-সাক্ষাৎ হইবার আশা করা যায় না। দূরের পথ, যাইতেও অনেক সময় নষ্ট হইয়া যাইবে।

মনোরমার মাতা এই বিপদের সংবাদে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে না পারিয়া তর্কতীর্থ মহাশয়ের কথামতই তাঁহার সঙ্গে কন্যা পুত্রকে লইয়া স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের উদ্দেশে বাহির হইলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় নিজের পত্নী ও কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

তর্কতীর্থ মহাশয় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তার পর নৌকা করিয়া বিক্রমপুর যাইতে হইবে। নৌকা ঠিক করিবার জন্য, ও যে কয়দিন নৌকায় থাকিতে হইবে, তাহার উপযুক্ত সব জিনিসপত্র যোগাড় করিয়া লইতে অন্ততঃ একদিন সময় যাইবে বলিয়া কলিকাতায় কোন পরিচিত ভদ্রলোকের বাসায় উঠিতে চাহিলেন। মনোরমার মাতা অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "চাল ডাল সামান্য কিছু হইলেই চলিবে। পরে যা কিছু দরকার পথের মধ্যে মাঝি-মাল্লাদের দ্বারা আনাইলেই হইবে। এর জন্য আর সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তর্কতীর্থ মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ তর্কে পরাস্ত হইয়া শেষে তাঁহার মতেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতার যে বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, সে বাড়ীর লোকজন সকলেই দেশে গিয়াছেন. মাত্র একজন সরকার বাড়ীতে আছেন। তিনি তর্কতীর্থ মহাশয়ের পরিচিত। তিনি অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া ইঁহাদের বাড়ীর মধ্যে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যে কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হইতে পারে সবই পূর্ব্ব হইতে যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। তাঁহাদের বিদেশে যাইবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে, সবই একে একে আসিতে লাগিল। অবস্থার অতিরিক্ত হইতেছে দেখিয়া, মনোরমার মাতা তর্কতীর্থ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "কেন এমন সব ফরমাস কর্‌ছেন, আমরা যেমন গরীব তেমনই ভাবে নিলেই হ'তো। পরের দয়ার দান এত সব নিতে আছে কি? সরকার মহাশয় তাঁর বাবুর হুকুম না নিয়ে এত বেশী খরচ ক'রে শেষে যে বিপদে পড়্‌বেন। আর দেরী ক'রে কাজ নাই। যত দেরী হবে বোঝা তত বেড়ে যাবে। চলুন আজই বেরিয়ে পড়া যাক্।"

তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন,—"আজ আর কি ক'রে যাওয়া হবে বৌঠান—জোয়ারের মুখে নৌকা ত যাবে না, ভাঁটার মুখে নৌকা ছাড়্‌বে। তা ছাড়া, নৌকা এখনও ঠিক হয়নি। সরকার মহাশয় ফিরে এসেছেন। আমি একবার যাই দেখে আসি, যদি কিছু কর্ত্তে পারি। নৌকা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি না।"

সন্ধ্যার সময় তর্কতীর্থ মহাশয় বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন, "বৌঠান দু'দিন নৌকা পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না। যুদ্ধের জন্য যত নৌকা দু'দিন ধ'রে মালপত্র সরবরাহ কর্ত্তে ধ'রে নিয়ে গেছে। দু' দিন পরে তবে তারা বাইরের কাজ কর্ত্তে হুকুম পাবে। সরকারের

কড়া হুকুম, কেউ যেন এ দু'দিন কলিকাতার বা'র না হয়। এখন কি করা যায় বল দেখি। আমি ত ভেবে ভেবে সারা হ'য়ে যাচ্ছি। কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না। যে দু'জন লোক সেখান হ'তে এসেছিলেন, এখন দেখ্‌ছি তাদের সঙ্গে আসাই উচিত ছিল। তাদের ক্লান্ত দেখে ছেড়ে আস্‌তে হ'লো। তুমি যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লে তখন। ভাব্‌তে সময় পর্য্যন্ত দিলে না। এখন করি কি? যত সব গ্রহের ফের। আমার পরামর্শে চল্‌লে কি আর এত কষ্ট হ'তো। বিধাতার ইচ্ছা যেমন, তেমনই ত হবে। যাক্‌, যখন বাবুর আশ্রয়ে আছি, তখন ততটা চিন্তা নাই, যা হ'ক্‌ একটা উপায় ক'রে দেবেনই। এমন বাবু কি আর কোথাও আছেন, না হয়।"

মনোরমার ও তাহার মায়ের অনেকবার ইচ্ছা হইতেছিল একবার জিজ্ঞাসা করে, এই বাবুটি কে? তাঁর বাড়ী কোথায়? যাঁহার বাড়ীতে তাঁহারা এই বিপদের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহার পরিচয় না জানিতে পারিয়া যেন মনের মধ্যে একটা বড় বেশী অভাব ও লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। মনোরমা দুই একবার তাঁহার কাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও, তেমন কোনও সদুত্তর না পাওয়াতে মনের মধ্যে অনেক প্রকারই ভাবিতেছিল। অথচ এমন সুযোগও পাইতেছিল না যে, সরকার মহাশয়কে নিভৃতে পাইয়া এই সকল কথা জানিয়া লইয়া মনের গোলযোগ মিটাইয়া লয়। মনোরমা যেদিন বাড়ীতে তাহার কাকা ও কাকীর কথা নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে মনে মনে তাহার কাকার উপর যে ধারণা করিয়া লইয়াছিল, সেই ধারণাই তাহাকে সব সময়ে এমন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছিল যে—তাহার কাকার প্রত্যেক্ কাজটিই সে

সন্দেহের চক্ষে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সব বিপদের মধ্যে আবার তাঁহার সহানুভূতি দেখিয়া মনে করিত হয় ত আমি কি শুনিতে কি শুনিয়া মনে মনে অন্যায় ধারণা করিয়াছি। কিন্তু এই নৌকা না পাওয়া, যাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহার নাম ধাম জানিতে না দেওয়া ও বিদেশে যাইবার জন্য অবস্থার অনেক বেশী অনাবশ্যক দ্রব্যের বৃথা আয়োজনে তাহার মনকে এমন সন্দেহে পীড়িত করিতেছিল যে, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, মাতাকে নিভৃতে ডাকিয়া সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিল।

মাতা কন্যার সন্দেহের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য না হইতেও পারে। তিনিই ভুল করিয়া,—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতে এমন সব অনর্থের সুযোগ দিতে বসিয়াছেন। এই বিদেশে জন-মানব-শূন্য শত্রুপুরীতে যদি এমনই ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে তিনি একা স্ত্রীলোক কি করিবেন। এ বিপদে কাহার সাহায্য পাইবেন। 'হে অগতির গতি, 'বিপদের বন্ধু, তুমিই ইহার উপায় করিও।' বলিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

বিপদের বন্ধুর নিকট এ ডাক কি ভাবে পৌছিল তাহা কে বলিবে? কিন্তু যাহার সূচনা মনের মধ্যে হইয়াছিল, পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা গেল।

শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মনোরমার মাতা শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, মনোরমা তাঁহার পার্শ্বে নাই। কমলারঞ্জন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মনে করিলেন, মেয়ে বোধ হয় বাহিরে গিয়াছে। এখনই

আসিবে, বলিয়া 'এই আসে, এই আসে' করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত অল্পক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ভয়কম্পিত স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "মনো—ও মনোরমা—একা কোথা গেলি মা।" পুনঃপুনঃ ডাকা-ডাকির পর যখন সাড়া মিলিল না, তখন মাতা আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া কন্যার সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রত্যেক ঘরখানি সন্ধান করিয়া কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া ছাদের উপরে গেলেন। সেখানেও তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া যখন নীচে আসিতে প্রস্তুত হইলেন, সেই সময় বাটীর পার্শ্বে বাগানের মধ্যে মানুষের গলার স্বরে তাঁহার মনে হইল, তর্কতীর্থ মহাশয়ই যেন সেখানে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। সেই শব্দের অনুসরণ করিয়া ছাদের একপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন যে, এক বিস্তৃত বিবাহ-সভা। তাঁহার কন্যা মনোরমা ক'নের আসনে বসিয়া আছে। আর তর্কতীর্থ মহাশয় সম্প্রদাতার আসনে বসিয়া মণিবাবুর দক্ষিণ হস্তের উপর মনোরমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া পুষ্পমাল্যে বাঁধিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন। মনোরমার মাতা পাষাণ স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া যেন তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই লোপ হইয়া যাইতে চাহিল। কতক্ষণ পরে যেন তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি যেন শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, "ওহে তোমরা দেখ্‌ছ কি, ক'নে যে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। শুভদৃষ্টি হবে কি ক'রে।" তার উত্তরে একজন বলিয়া উঠিল, "বড় ত বিয়ে তার আবার দু'পায়ে আল্‌তা। যে বিয়ের যেমন মন্ত্র- তাই ক'রে সেরে ফেল। এখন গাঁইট-ছড়া বেঁধে দিন পুরোহিত মহাশয়।" তার

পর শুনিতে পাইলেন, তর্কতীর্থ মহাশয় কোনরূপে ভয় কম্পিত কণ্ঠে জড়িত স্বরে বলিতেছেন,—

"যথেন্দ্রাণী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈব বিভাবসো
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।
যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি ॥"

দেশময় প্রচার হইয়া গেল, মণিবাবুকে কন্যাদান করিয়া স্মৃতি-তীর্থ মহাশয় তাঁহার কৌলীন্যের ভিত্তি খুব দৃঢ় করিয়া দিলেন। মণিবাবু দেশে আসিয়া খুব ঘটা করিয়া পাকস্পর্শ সমাধা করিলেন। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পাকস্পর্শ সমাধা হইল, তিনি কিন্তু একমাত্র বৃদ্ধ দেওয়ান গাঙ্গুলী মহাশয়কেই অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিলেন। তাহার পর আর কাহারও সম্মুখে বাহির হইলেন না এবং কাহারও কোন যৌতুক স্পর্শ করিলেন না। গাঙ্গুলী মহাশয়কে পরিবেষণ করিবার সময় ক'নের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এই আনন্দের দিনে কেন এরূপ হইল, একমাত্র গাঙ্গুলী মহাশয় তাহা কতক অনুমানে বুঝিতে পারিলেন।

সন্ধ্যার সময় গাঙ্গুলী মহাশয়কে ডাকিয়া মণিবাবু বলিলেন,— "স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের স্ত্রী ও পুত্র কলিকাতার বাড়ীতে আছেন। তাঁহাদের সেখান হইতে লইয়া বিক্রমপুরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট রাখিয়া আসিবার ভার আপনাকে লইতে হইবে। তর্কতীর্থ মহাশয়ের শরীর বড়ই খারাপ। তিনি এখন আর যাইতে পারিবেন না।"

বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের মাথায় বজ্রপাত হইলেও তিনি তাহা মাথা পাতিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি এ আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন না; তিনি বলিলেন, "যা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমাকে কেন এ বিষয়ে জড়াইতে চাও, আমা অপেক্ষা বিশ্বাসী, হিতাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী যে কোন লোকের উপর এই ভার দাও। আমাকে অব্যাহতি দাও। আমার আর কোনও কাজ করিবার শক্তি-সামর্থ্য নাই।"

মণিবাবু অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—"আমার ইচ্ছার উপরে আপনার চাকুরী নির্ভর করে না। যিনি আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট আপনার সম্বন্ধে কোন কথা না শুনিলেও যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার কথায় আপনার থাকা বা যাওয়ার কোনও সম্বন্ধই তিনি রাখিয়া যান নাই। তবে আমার অনুরোধ, আপনি ইহাদের তথায় রাখিয়া আসিয়া আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন। এর পূর্ব্বে আমি আপনাকে কোন কার্য্য করিতে বলি নাই, এর পরও কোন কার্য্যের ভার আর আপনার উপর দিব না—আপনার উপর আমার আদেশই বলুন, কর্ত্তৃত্বই বলুন, আর শত অনুরোধই বলুন—এই প্রথম ও শেষ।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "এত বড় অন্যায় এর পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। আমি ইহার পরিণাম ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের উপর কি না চক্রান্ত করা হইল। অবশেষে তাঁহাকে দেশত্যাগী করাইলে। সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের মনোবেদনা যে অভিসম্পাতের কার্য্য করিবেই তাহার আর ভুল নাই। আমারও এমনি ভাগ্য যে আমি সেই অভিসম্পাতের রাশি মাথায় করিয়া বহিয়া আনিয়া আমার অন্নদাতার বংশের উপর ছড়াইয়া দিব? শুধু কি এই

কার্য্যের এইখানেই শেষ হইবে। পিতার অমতে মাতার আজ্ঞাতে বল-পূর্ব্বক একটা কুমারী কন্যার সর্ব্বনাশ করিবার শক্তি কোথা হইতে পাইলে মণিবাবু! এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়াই বুঝি স্বর্গীয় বাবু মহাশয় বলিয়া-ছিলেন, 'আমি পুত্রহীন'। আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম বাবুর এটা বড় অবিচার হইতেছে। ছেলের একটা ক্লেদের কথায় এত বড় শাস্তি দেওয়া বাপের উচিত কর্ম্ম হইতেছে না। তাঁহার ভুলের সংশোধন করিতে যাইয়া আমরাও খুব বড় একটা ভুল করিয়া বসিলাম। নূতন মায়ের সাহায্যে তোমাকে দেশে আনাইলাম। তাহার পরিণাম যে এমন হইবে তাহা যদি বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আজ দেশের অবস্থা এমন হয়। দেশের মধ্যে গণ্যমান্য লোক একজনও নাই। সকলেই তোমার অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়াছে। তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া কার্য্যের অছি-লায় নিজের নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যই সকলে বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর যত সব মন্দের বস্তা তোমার গুদামজাত হইয়া তোমার অপকর্ম্মের ব্যবসায়ের পণ্য হইয়াছে। তুমি কি মনে কর কখনও মনে শান্তি পাইবে। তোমার অদৃষ্টে সুখ নাই—শান্তি নাই। যাক্, আমি আর আমার অন্নদাতার বংশের উপর অভিসম্পাত দিয়া পাপের ভার বাড়াইব না। তবে দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় এই পাপের পরিণাম কি? আর দেখিতে ইচ্ছা হয়, যাহাদের তুমি ছলে, বলে, কৌশলে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেশত্যাগী করিয়াছ, তাদের সত্য-পথে থাকার পরিণাম কি?"

বৃদ্ধ গোবিন্দ গাঙ্গুলী গায়ের জ্বালা মিটাইয়া মণিবাবুকে আরও কত কি বলিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, আসন্ন মৃত্যুমুখে পড়িয়া দুইটী জীব বুকফাটা কান্নায় মাটী ভিজাইতেছে। মনোরমার

মাতা সেই যে ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া শয্যা লইয়াছিলেন, আর উঠিতে পারেন নাই। তিনদিন হইল, মুখে জল পর্য্যন্ত না দিয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন। আর বালক কমলারঞ্জন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের স্বর বদ্ধ করিয়াছে; জ্বরের ঘোরে-বিকারে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিয়া মধ্যে মধ্যে সেই ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিতেছে। এই পাষাণ-ভেদী দৃশ্য দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া একে একে সব ব্যবস্থা করিলেন।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে দুই পাঁচদিন মধ্যেই রোগীদের অবস্থা অনেকটা ভালর দিকে আসিতেই, গাঙ্গুলী মহাশয় একজন লোককে বিক্রমপুরে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, মনোরমার বিবাহের সংবাদ যেন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শুনিতে না পান; স্ত্রী ও পুত্রের জীবন-সংশয় অসুখ, তাঁর আসা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই জানাইবার উপদেশ দিলেন।

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। একে একে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলেন, "একবার মাত্র মনোরমার সহিত দেখা করিতে চাই। যদি সম্ভব বিবেচনা করেন, আমাকে তাহার নিকট লইয়া চলুন।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "আর কেন বৃথা মনোকষ্ট বাড়াইবেন, যাহা ভবিতব্য তাহা হইয়া গিয়াছে। মনে করুন আপনার কন্যা নাই।"

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিলেন, "এ বিবাহ অসিদ্ধ। আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চাই। তাহার উপর আর কাহারও অধিকার নাই। আমি জানিতে চাই মনোরমা কখনও মনের মধ্যে সেই পাষণ্ডকে সেই কুলাঙ্গারকে

স্বামিভাবে দেখিতে পারিবে কি না? আমি জানি আমার কন্যা কখনও মন্দকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিবে না; কখনও মন্দকে—পাপকে প্রশ্রয় দিবে না। আমি জানি যে আমার সন্তান মনোরমা কখনও তাহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে পারিবে না। সে এমন কুকর্ম্মীকে ক্ষমা করিয়া সংসারে পাপের বংশ বাড়াইবার সহায়তা করিবে না। তাই আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে চাই। আর তাহাকে শিক্ষা দিতে চাই, সে যেন কখনও পাপের পথে না যায়, তাহার নারীধর্ম্ম রক্ষা করিতে সে কখনও যেন বিমুখ না হয়। আমার কন্যা—আমার মনোরমা যেন তার সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নারীর মর্য্যাদা—নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। আর যদি এমনই হয়,—পাশবিক অত্যাচারে পীড়িত হইয়া তাহার সন্তান জন্মে, তবে সে যেন তাহাকে সুশিক্ষা দিয়া তাহার জন্মের ইতিহাস শুনাইয়া বলে, 'তুমি সংসারের—সমাজের মঙ্গলের জন্য সনাতন প্রথার বিধি-পদ্ধতি রক্ষার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে চিরকুমার থাকিয়া তোমার অসিদ্ধ পিতৃবংশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর মাতৃশক্তি মাতৃ-পরিচয়ই তোমার জীবনের অবলম্বন।' এর বেশী আর আমার বলিবার কিছু নাই। আমি আপনাকে এই ভার দিয়া তীর্থবাসী হইব।"

১০

মনোরমার রূপমুগ্ধ হইয়া মণিবাবু একবারও ভাবেন নাই যে, ছলে, বলে, কৌশলে, তাহাকে লাভ করিলেই সে তাহার ভোগ্যা না হইয়া অশান্তির কারণ হইবে। মনোরমার মনস্তুষ্টির জন্য মণিবাবু স্তবস্তুতির কোন ত্রুটিই করিলেন না। তাহাকে বাধ্য করিবার জন্য, মনের মত

গড়িয়া তুলিবার জন্য অবশেষে দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। মনে করিলেন, আবাল্যের স্মৃতি এখানে জড়িত রহিয়াছে; তাহার উপর মা-বাপ নাই, খুড়া-খুড়ী সকলেই এখন দেশ-ছাড়া। মা-বাপ ভাই সকলেই তাঁহার চক্রান্তে দেশত্যাগী। আর অর্থের দাস তর্কতীর্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার জন্য আশাতিরিক্ত অর্থ লইয়া ইচ্ছা করিয়া অন্যত্রে আছে। এই সব স্মৃতিতে মনোরমার মন প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে। তাই, কিছু দিনের জন্য তাহাকে অন্যত্রে লইয়া যাইয়া, মনের মধ্যে এ সকল ভুল ধরাইয়া দিতে হইবে। নতুবা সে তাঁহাকে কোন প্রকারেই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবে না। এই সব ভাবিয়াই মণিবাবু ইচ্ছা করিলেন, তিনি সপরিবারে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবেন। দুই তিন দিন মধ্যেই তাঁহার আবশ্যক দ্রব্যের যোগাড় করিবার জন্য কর্ম্মচারী মহলে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। আদেশের অনেক অতিরিক্ত দ্রব্যও আসিয়া পড়িল। কিন্তু তখন মণিবাবুর মনের অবস্থা এমন উচ্চ ছিল যে, কাহারও ত্রুটী ধরিবার চির অভ্যাস মনেই পড়িল না। যে যাহা করিতেছিল, যে যাহা আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া তাহার আবশ্যক গুণ বর্ণনা করিতেছিল, তাহাই তাঁহার ব্যবহারে লাগিতে পারে ও বিদেশে যাইতে হইলে এ সব সঙ্গে থাকা উচিত মনে করিয়া. তাহার কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। ফর্দ্দের মত সমস্তই হইল; অধিকন্তু যে যাহার স্বার্থের পূরণ করিবার জন্য যত বেশী পারিল সবই যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিল। লটবহর বাধিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া বারে বারে মিলাইয়া দেখা হইল। যাত্রার সময় পরদিন সন্ধ্যার পর। তবে বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয়ের অপেক্ষায় তখনও কিছুই পাকাপাকি হয় নাই। প্রায় পনর দিন হইয়া গেল, তিনি এখনও ফিরিলেন না।

গাঙ্গুলী মহাশয় আসিলে মনোরমা তাঁহার মুখেই পিতামাতার সংবাদ শুনিবেন বলিয়া মণিবাবু অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং নিজে মনে মনে আশা করিতেছেন যে ইহাতে যদি মনোরমা তাঁহার প্রতি প্রীত হয়। আর সকলকে বলিতেছেন, বাহিরে হয় ত যাওয়া হইতে নাও পারে। কারণ কি, কে তাহা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ?

পরদিন মধ্যাহ্নে সংবাদ আসিল যে, বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে কলিকাতায় আনাইয়াছেন। সেখানে সকলেরই অসুখ। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আর দেশে আসিবেন না ; তাঁহার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় দেশে আসিবেন। তিনি যে কতদিনে ফিরিতে পারিবেন, তাহা তিনি নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দেন নাই। মণিবাবু এই সব শুনিয়া, মনে মনে বলিলেন, স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যে দেশে আর ফিরিবেন না এ ত জানা কথা। পাছে স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় এখান পর্য্যন্ত আসিয়া পড়েন, সেই জন্যই ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের উপর সে ভার দিয়াছিলেন। তবে তিনি আবার এরূপ সময়ে কলিকাতায় আসিলেন কেন ? আর যখন সেই সুদূর বিক্রমপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তখন কি একবার এই সাতপুরুষের বাস্তুভিটা না দেখিয়া যাইবেন এবং যদিই এখানে আসিয়া, মনোরমার সহিত দেখা করিতে চাহেন, তবে কি করা যাইবে ? আর যদি এতদূরই তাঁর মনে না হয় তবু ত গ্রামে আসিয়া গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে, শুধু গ্রামের কেন পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানা গ্রামে যদি পরিচিত অপরিচিত সকলকেই এই গোপন বিবাহের কথা বলিয়া বেড়ান, তাহা হইলে এত যত্নের প্রস্তুত নানা কৃত্রিম জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। মাথাও হেঁট হইবে। কাজ

নাই আর দেরী করিয়া ; আজই সরিয়া পড়া ভাল। কি জানি কখন সেই ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তিতে আসিয়া তাঁহার উপর একটা যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন ও শাপান্ত করিবেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই অপরূপ সুন্দরী মনোরমাকে দেখিয়া, বিশেষ তার অসীম ধৈর্য্যশক্তি দেখিয়া আমার মনের মধ্যে অতি নিভৃতে যে, ভয়ের একটা ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, এ কথা পরের নিকট স্বীকার নাই করি, কিন্তু নিজে বেশ বুঝিতেছি ত। ওঃ ! কি তেজ এই একটা স্ত্রীলোকের। যতই তাহাকে নিজের করিয়া লইব মনে করিতেছি, সে ততই যেন আমার সংস্রব হইতে অতি দূরে চলিয়া যাইতেছে। সংসারে এই জাতিকে যত প্রকারে মুগ্ধ করিবার প্রণালী আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই ইহার কাছে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখা যাক, চিরজয়ী মণিমোহনের জেদ এই একটা সামান্যা বালিকার নিকট বজায় রাখিতে পারে কি না ? ভাল হউক, মন্দ হউক এ একদিনের জন্যও ইহাকে স্বীকার করাইব যে আমিই তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা—স্বামী। ইহাতে যদি আমাকে পথের কাঙ্গাল হইতে হয় সেও স্বীকার।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় মণিবাবু সাঙ্গোপাঙ্গোদিগের উপর নিজের মহলের ও বাড়ীর যাবতীয় ভার দিয়া মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। গ্রামের প্রান্তে যে নদী, সেইখানে পূর্ব্ব হইতেই বজরার ব্যবস্থা করা ছিল। যথাসময়ে সুবৃহৎ বজরাখানি হেলিয়া-ডুলিয়া অনির্দ্দেশ্য পথে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাহির হইয়া গেল।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী মহাশয় মাস দুই পরে দেশে ফিরিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও মণিমোহনবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে সংযত করিয়া মহলের

মধ্যে অত্যাচারের স্রোত কোন প্রকারেই কমাইতে পারিলেন না। তিনি যত বাধা দেন, ততই যেন তাহারা উৎসাহ পাইয়া বৃদ্ধের অপমান করিবার জন্যই আরও অধিক ভয়াবহ অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়া মহলের প্রজাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিতে থাকে। চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে; দেশে আর কাণ পাতা যায় না। চারিদিক্ হইতেই বিপন্ন প্রজারা আসিয়া বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে অভিভাবকের মত জড়াইয়া ধরে। যেমন ভীতিগ্রস্ত শিশু পিতামাতাকে পাইলে ছুটিয়া আসে, তেমনই ভাবে প্রতিনিয়ত বিপন্ন প্রজারা দেওয়ানজীর নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মণিবাবুর কোনও সংবাদ নাই, তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় নানা স্থানে লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কেহই সন্ধান আনিতে পারিল না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় দেশের অবস্থা দেখিয়া শেষ বয়সে দেশের বাড়ীতে চাবি দিয়া সপরিবারে কাশীধামে গেলেন।

১১

এক মাস দুই মাস করিয়া বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, মণিবাবুর কোন সন্ধানই কেহ পাইল না। দেশের কেহ সন্ধান পাইবে, কার্য্যের বোঝা লইয়া গিয়া সময়ে অসময়ে জ্বালাতন করিবে, মণিবাবু সে পথ রুদ্ধ করিয়া একেবারে এতদিন ধরিয়া নববধূর প্রেমে নিমজ্জিত রহিলেন মনে করিয়া সর্ব্বসাধারণে বিস্মিত হইল। কেহ কি কখনও বিবাহ করে নাই, না, আর কাহারও সুন্দরী বধূ হয় নাই! দেশে ত আরও অনেক বড়-লোক আছেন; কয়জনই বা এমন করিয়া কাজ-কর্ম্ম

ছাড়িয়া, এতদিন ধরিয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া, নববধূর মনোরঞ্জনে তন্ময় হইয়া থাকে। হায়, তাহারা ত জানে না যে, কি ভাবে মণিমোহন বিবাহ করিয়া এই এক বৎসর কাল দিবারাত্রি ধরিয়া মনোরমার মনস্তুষ্টির জন্য কি না করিয়াছেন। শেষে ধৈর্য্যের বাঁধন আর রহিল না। যখন কোন প্রকারেই মনোরমা মণিবাবুকে প্রীতির চক্ষে দেখিল না, এক দিবসের জন্যও কোন কথা কহিল না, তখন অসদুপায়ে তাহাকে বশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মণিবাবু নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে জীবের মুক্তিধাম ৺কাশীধামে আসিলেন।

হিন্দুর যে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র একদিন মুক্তিধাম জানিয়া শত শত মুমুক্ষু নরনারী বাবা বিশ্বনাথের পাদপ্রান্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিত, আজ সেই তীর্থক্ষেত্রে মণিমোহন তাঁহার লালসার তৃপ্তি সাধনের জন্য যে পথ অবলম্বন করিলেন, সে ভীষণ নৃশংসতা ধরিত্রী সহ্য করিতে অক্ষম। আর এই যুগ মাহাত্ম্যের ফলে ভূস্বর্গ কাশীধাম, শুধু কাশী কেন প্রত্যেক তীর্থই কোন্ পাপে জানি না, যত কিছু পাপের বোঝা লইয়া এমন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে যে তীর্থের কথা মনে উঠিলেই পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের দৃশ্যই মনে আসে, ভয় হয়,—হৃদয় যেন অবসন্ন হইয়া উঠে।

এই এক বৎসর মনোরমা মূক হইয়াছিল, প্রাণধারণের জন্য সামান্য মাত্র আহার করিত। পরিচারিকারা তাহাকে জোর করিয়া স্নান করাইয়া নানা বেশভূষায় সাজাইয়া দিত। এই সব আদর-আপ্যায়ন যেন সে নির্যাতনের মত গ্রহণ করিত। মণিমোহন কলিকাতা হইতে বয়োবৃদ্ধা বারাঙ্গনা আনাইলেন। তাহাদের হিত বাক্যময় অহিতাচরণ মনোরমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহারা চিরদিন পাপের মধ্যে

পালিত, পাপকর্ম্মে জীবন শেষ করিয়াছে, তাহাদের নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতে হইল। নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া, তাহাকে সময়ে অসময়ে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সে মৃত্যুকে অনেকবার ডাকিয়াছে। কত উপায়ে সে মরিতে গিয়াছে ; কিন্তু সেও অতি কৃপণের ধনের মত তাহার সম্মুখে আসিতে সম্মত হয় নাই।

একদিন সন্ধ্যার পর সুসজ্জিত কক্ষে মনোরমার অপ্সরানিন্দিত রূপকে আরও মনোমুগ্ধ করিয়া সাজাইয়া পরিচারিকারা সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সারাদিন সে কিছুই খায় নাই, তাহার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিয়া অবশেষে মাদক দ্রব্য পান করাইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে। মনোরমা সন্ধ্যার প্রথমেই, অবসাদ ক্লান্তিতে নিদ্রা যাইবার জন্য শয্যাগ্রহণ করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্ব-সন্তাপনাশিনী নিদ্রাদেবীর শান্তিময়ী ক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া স্বপ্নে দেখিল, তাহার পিতা যেন আসিয়া 'মা মা' করিয়া ডাকিতেছেন ; আর বলিতেছেন, 'মা, মনো, আমি তোমার গর্ভে জন্ম লইবার জন্য এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছি। তোমার মায়া শত চেষ্টাতেও কাটাইতে পারি নাই, তোমার মুখ শত চেষ্টাতেও ভুলিতে পারি নাই। তাই তোমার সন্তান হইয়া তোমার অযোগ্য পিতা আবার এই পৃথিবীতে আসিল। আর এক জন্মে কঠোর তপস্যায় ইহজীবনের কর্ত্তব্য-ক্রটির প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই পবিত্র ভূমি কাশীধামে গঙ্গার ঘাটে তোমার আশ্রয়দাতা মিলিবে। মা আমার, কন্যা আমার।' মনোরমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, তার পর মনে হইল, স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়, দিবারাত্রি আমাকে এক চিন্তায় অভিভূত

রাখে বলিয়াই এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তন্দ্রা স্বপ্ন সুষুপ্তির মধ্যে আবার সে শুনিতে পাইল, তাহার পিতা যেন তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেছেন। আবার জাগিয়া উঠিল। আর সে নিদ্রা যাইতে পারিল না। বিছানার উপর বসিয়া রহিল। এই ভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে যখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল এক উন্মত্ত পুরুষ তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া,—"মনোরমা, আমার মনোরমা,—প্রাণের মনোরমা" বলিয়া চীৎকার করিতেছে।

মণিমোহন মদ্যপানে উন্মত্ত,—তাহাতে কামাতুর। কাম-পিপাসায় মনোরমার সৌন্দর্য্য-ভরা দেহ ভোগ করিবার জন্য তাহার সকল দেহ দৃঢ়, নাসিকা বিস্ফারিত ও ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের মত তাহার চক্ষু দীপ্ত, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আবেগে কম্পিত হইতেছে। আর মনোরমা আত্মরক্ষার জন্য ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কখনও প্রাণপণ শক্তিতে মণিমোহনের বাহু বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। এমনি বহুক্ষণ ব্যাঘ্রতাড়িত হরিণীর ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে অবসন্ন হইয়া সেই ঘরের মধ্যে পড়িয়া গেল। নারীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ রত্ন অপহৃত হইল। অবশেষে তাহাকে অজ্ঞানাবস্থায় একাকী রাখিয়া পাপাত্মা সদলবলে কাশীধাম ত্যাগ করিল।

মনোরমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে একে একে সমস্ত ঘটনাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। পিতামাতার স্নেহ আবরণে বর্দ্ধিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে, সবই যেন তাহার

স্মৃতিপটে পুনঃ পুনঃ আসিয়া বলিতে লাগিল,—আর জীবনের বৃথা ভার বহন করিয়া কি করিবে। নারী-জীবনের সার অমূল্য ধর্ম্ম যখন তোমার নাই, তখন আর কেন? কি আশায় এ জীবন বহন করিবে। তোমার নিজের ধর্ম্ম যখন অপরে সবলে নষ্ট করিয়া দিল, তখনই তোমার বোঝা উচিত যে, ঈশ্বরের রাজ্যে, তাঁহার দিব্য চক্ষুর উপর পুণ্যতীর্থ কাশীধামে ভূস্বর্গে তীর্থে যে পাপ করিতে বাধ্য হইলে, তাহা জন্মজন্মান্তরে তোমাদের পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিবেই, আর অন্য গতি নাই। তার পর মনে হইল, তাহার পিতা যে তাহাকে পুত্রের সমান আদর যত্নে শিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি এই! পিতার অজ্ঞাতে পিতৃব্যের চাতুরীতে পড়িয়া যে পাশব শক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইল, তাহার প্রতিকারের কি কোনও উপায় নাই! নারীর জীবন যদি এইরূপ ভঙ্গুর, তবে বিধাতা ইহাতে প্রাণ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন কেন? একটা জড়ের মত করিয়া গড়িয়া পাঠাইলেও ত বিশেষ কিছু হানি হইত না। জন্ম-জন্মান্তরে ইহার পাকা ছাপ লইয়া—সংস্কার লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। যাক্, এখন উপায়! তার পর মনে পড়িল, কলিকাতার বাড়ীতে সেই বিবাহের অভিনয়। অভিনয়ই তো,— তা ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায়। মাতৃক্রোড়ে শায়িত অবস্থায়, মাতা, ভ্রাতা ও তাহাকে অজ্ঞান করিয়াছিল। সেই নরাধম পাষণ্ড নিজের মুখে নিজের বিবাহের ইতিহাস বলিবার সময় এ কথা স্বীকার করিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আমি উপযুক্ত ডাক্তারের সাহায্যে প্রথমে তোমাদের তিনজনকেই অজ্ঞান করাই। পরে তোমাকে সেখান হইতে নিজে হাতে তুলিয়া আনি। তর্কতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা বিবাহের যথারীতি দান

কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইয়াছি। ধর্ম্মত—শাস্ত্রত— লোকত তুমি আমার পরিণীতা ভার্য্যা। তোমাকে শাসন ও রক্ষণ করিবার ভার সম্পূর্ণ আমার হাতে। কোন প্রকারেই আমি তোমাকে অন্যায়ের সাহায্যে পাইতে চাহি নাই। তোমার কাকার একান্ত ইচ্ছায়, তোমাকে বিবাহ করিয়াছি।”

মনোরমা সেই সব শুনিয়া সর্ব্বপ্রথম ও শেষ মণিবাবুর সহিত কথা কহিয়া বলিয়াছিল—“আমি জানি, পিতামাতার বিনা আদেশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার অধিকার কাহারও নাই। ছলে বলে যে বিবাহ সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। আমার অজ্ঞাতে, আমার পিতামাতার অজ্ঞাতে আমার বিবাহ! এ বিবাহ অসিদ্ধ। আমি আপনার অস্পৃশ্য। আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে অগ্রসর হইবেন না। আমার পিতার অভিসম্পাতে সমস্ত ছারখার হইয়া যাইবে। আমায় দয়া করিয়া ত্যাগ করুন—মা-বাপের নিকট পাঠাইয়া দিন।”

মনোরমার কথা শুনিয়া মণিবাবু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিয়াছিল—“তাই যদি হয়, বিবাহই যদি তোমার মতে অসিদ্ধ হয়, তুমি যদি আমার অস্পৃশ্য হও, তোমার পিতার অভিসম্পাতে যদি ভস্মই হইতে হয়, আর যদি তোমায় ত্যাগ করিতেই হয়, তবে—তবে তোমাকেও আমি সর্ব্বসাধারণের অস্পৃশ্য করিয়া তোমার নারীজীবনকে ভস্মে পরিণত করিয়া ত্যাগ করিব। মণিমোহন যাহা বলে তাহা করে, এ কথা মনে রাখিও। একদিনের জন্যও তোমার এই অপরূপ রূপ আমার ভোগ্য হইলে পরে তোমার মতে আমার মত এক হইবে; তখন আমিও বলিব—এ বিবাহ অসিদ্ধ।”

১২

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে একদিন অপরাহ্নে একজন সন্ন্যাসীর নিকট এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি অন্ত নাই। চারিদিকেই লোকারণ্য। সুবিস্তৃত পাষাণ-নির্ম্মিত ঘাটের বিস্তৃত বক্ষে—প্রত্যেক ধাপেই নানা দেশের নানা প্রকারের লোক বসিয়া আছেন। এই ভূস্বর্গ কাশীধামে পুণ্যতম স্থান দশাশ্বমেধ ঘাটে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বয়ীয়সী নারী প্রত্যেকেই ভ্রমণ ও সন্ধ্যাবন্দনা করিবার জন্য নিত্যই সমাগত হন। কেহ বা বসিয়া জাহ্নবীর পূত বারি-সংস্পর্শ সমীরণ সেবন করিতেছেন; কেহ বা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকে মগ্ন হইয়া আছেন। আবার কোথাও একদল যুবা পরিহাসপটু এক বৃদ্ধকে ধরিয়া সেকালের কথা শুনিয়া যাইতেছে, আর একমুখে চতুর্মুখের সমান করিয়া সে-কালের দোষ দেখাইয়া বৃদ্ধকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। আর ভূয়োদর্শী সেকালের বৃদ্ধ গায়ের জ্বালা মিটাইয়া একালের এক একটী দোষের জীবনই যে তাহাদের আদর্শ, তাহারা সেই ভাবেই জীবন গঠিয়া তুলিতেছে, তাহাও মর্ম্মে আঘাত করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। আবার কোথাও পূর্ব্ব-বঙ্গের এক বৃদ্ধ কলিকাতার এক বৃদ্ধের সহিত তাঁহার দেশের কথা কত কোমল, আর কলিকাতার কথা কত কর্কশ, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতেছেন, "এই দেখুন, আমার দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা কত নম্র কথায় বলে—'আহনি কেহন আছেন মহাই।' আর আপনারা যেন গুরুগম্ভীর স্বরে সকলেই বলেন 'আপনি কেমন আছেন

মশাই।” আবার কোথাও একজন বাউলের গান গাহিয়া নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। কত লোক তাহার সেই সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে। আবার কোথাও একজন তন্ময় হইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া ‘মা, মা আমার’ বলিয়া প্রাণভেদী স্বরে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কেহ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, কেহ পুলকিত ভাবে স্তব পড়িতেছেন। এই জন-মনোরম প্রাণারাম তীর্থের প্রত্যেক স্থানই যেন চিরদিনই চির নূতন ভাবে চলিতেছে। আমার লেখনী প্রাণের উপলব্ধি যে ভাষায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতেছে না; যাহা যে ভাবে দেখিয়াছে, যাহার চিত্র হৃদয়ে যে ভাবে আঁকিয়া সেই সুদূর পুণ্যতীর্থ হইতে বারেবারে ফিরিয়া আসিয়া মন প্রাণকে গুরুভারে নিত্য অবনত করিতেছে. তাহাতেই যেন সব আশা আকাঙ্ক্ষা নিত্যই যেন অন্ধ হইয়া যাইতেছে,— স্থান মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে এই জ্ঞান-অন্ধ বধিরতার সঙ্গদোষে পড়িয়া আমার লেখনীও সেই দোষে দুষ্ট হইয়া আর চলিতে চাহিতেছে না। মনের চাবুকে শতবার ঘা খাইয়াও যেন ভাষা ঝঙ্কার তুলিতে পারিতেছে না। হৃদয় যেন বলিতেছে, ‘এ অক্ষমতার জন্য বিশ্বের নিকট, বিশ্বদেবতার নিকট প্রাণ ভরিয়া ক্ষমা চাও, অক্ষমতা স্বীকার কর নতুবা অন্য গতি নাই।’ যাক্, যা বলিতেছিলাম, যাঁহাদের লইয়া আমার কাজ তাঁহাদের কথাই হোক্।

একজন সন্ন্যাসীর সহিত এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী যে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহাই এখন বলা যাউক। বৃদ্ধ বলিতেছেন, “স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়। এই স্বপ্নের রাজ্যে, এই স্বপ্নময় জগতে তাহা কেনই বা আসে; যদিই আসে, কেন তাহা সত্যে পরিণত না হয়?”

"সবই হয় বাবা, এই স্বপ্ন-জগতে সকলই আবার অসম্ভব! এখানে রূপহীনের চির রূপ অধিষ্ঠান করিতেছে, আবার তিনি নিত্য অরূপ হইয়াও বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। প্রাণের আকুলতার সঙ্গে, মনের ব্যাকুলতার সঙ্গে একাগ্র হইয়া, তন্ময় হইয়া যাহা করিবে, যাহা ভাবিবে, তাহাই কার্য্যে পরিণত হইবে। তীব্র পুরুষকারের নিকট দৈব চিরদিনই নত হইয়া আছে। সাধারণের নিকট সাধারণ কর্ম্মে এই দৈবই এত কঠিন, এত অব্যর্থ যে তাহার তুলনা, তাহার উপমা নাই। যদি কিছু থাকে, তবে সমুদ্রের উপমার মত সমুদ্রই আসিবে। দৈবের স্থানে দৈবই আসিবে। পুরুষকারের অক্ষুণ্ণ চিন্তন যদি নিদ্রা জাগরণে, স্বপ্ন-তন্দ্রার মধ্যেও কেহ না ভুলে, তবে তাহার কখনও অন্যথা হয় না। আজ হউক, কাল হউক, দুইদিন পরে হউক, আর পরমুহূর্ত্তেই হউক সফল হইবে। একাগ্রতা কখনও নিষ্ফলে যায় না। কি স্বপ্ন দেখিয়াছ বাবা, যাহার জন্য আজ তোমার মন এত ভার, চিন্তা তোমার ললাটরেখাকেও স্ফীত করিয়াছে। বলিতে দোষ আছে কি?"

"না, দোষের কথা নাই। আর থাকিলেও আপনার ন্যায় ত্রিকাল-দর্শী মহাপুরুষের নিকট বলিতে কোন বাধা নাই। গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমাদের দেশের একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে দেশের জমীদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এক অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে দুর্ব্বৃত্ত জমীদার বলপূর্ব্বক বিবাহ করেন। বিবাহের সময় সেই কন্যা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। কন্যাও বিবাহ হইতেছে বলিয়া তখন জানিতে পারে নাই। পিতাও বিবাহ স্বীকার করেন না। পিতৃব্যের চক্রান্তে এই সব হইয়াছে।

জমীদার তাহার মতে বিবাহিত সেই কন্যাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কন্যার পিতাও দেশের উপর বিরক্ত হইয়া দেশত্যাগী হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় আমারই সাহায্যে তীর্থে বাস করিতেছেন। দিবারাত্রি যাহা কিছু ভাবিতেছি, তাঁহাদেরই বিষয়ে। যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাও তাঁহাদেরই বিষয়ে। জানি না, এর ফলাফল কি? গত রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখিয়াছি, সেই ব্রাহ্মণ—আমরা তাঁকে স্মৃতিতীর্থ মশায়ই বলিতাম—তিনি আসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন—'দেওয়ান মশায়, ইহজীবনে তো মনোরমাকে (তাহার কন্যার নাম) রক্ষা করিতে পারি নাই। কন্যা কুমারী অবস্থায় পিতার রক্ষণীয়। আমি ত তাহা পারি নাই। তাহাতে জীবনে সর্ব্বপ্রথম ও শেষ কর্ত্তব্যের ক্রটী হইয়াছে। তাহাতে আমাকে ও আমার উদ্ধতন এবং অধস্তন সপ্তপুরুষে পাপস্পর্শ করিয়াছে। তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে না পারিলে আর কাহারও নিষ্কৃতি নাই। তাই মনে করিয়াছি, এই পবিত্রতম তীর্থে আমি মনোরমার পবিত্র গর্ভে আবার জন্মগ্রহণ করিব। চিরজীবন অন্ধ নরকে পড়িয়া থাকা অপেক্ষা একটা জন্ম লইয়া সাধনার দ্বারা সকল পাপের, সকল কর্ত্তব্য-ক্রটীর প্রায়শ্চিত্ত করিতে দোষ কি? তবে যখন মনে হইতেছে যে, একজন কামুকের কামপত্নীর গর্ভে রাক্ষস-বিবাহের ফলস্বরূপ আমাকে জন্মাইতে হইতেছে, তখন যেন মনের মধ্যে হাহাকার করিতেছে। আবার মনে হইতেছে,—ব্রাহ্মণ শরীরে যতই কেন অত্যাচার করুক না—অত্যাচারী হউক না, সে যে ভগবানেরই নিম্ন আসনে বসিবার জন্মগত অধিকার পাইয়াছে। তখন মনোরমার উদ্ধারের জন্য—একজন ব্রাহ্মণ-কন্যার উদ্ধারের জন্য আমায় এ কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে। নতুবা এত কঠোর

তপস্যা করিয়া আর কে তাহার পিতৃপুরুষের উদ্ধার করিবার ভার লইবে। তবে ভাই, তুমি যেন আমার সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইও না। অতি-বিস্মৃতিই মানবের মৃত্যু। আমায় যখন অতি-বিস্মৃতিতে ফেলিবে, আমি যখন নব-কলেবরে মনোরমার পুত্ররূপে আবার ধরায় আসিব, তখন তুমি আমাকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিও। আমার জন্ম-বিবরণ আমাকে শুনাইয়া দিও। আর বলিও, তোমার পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করিবার ভার লইয়াই তুমি জন্মিয়াছ ; সনাতন পদ্ধতি রক্ষা করিবার জন্য, সমাজের নিয়ম রক্ষার জন্য তুমি চির-কৌমার্য্য ব্রত ধারণ করিয়া ঈশ্বর আরাধনা করিও। ইহা তোমার মৃত মাতামহের আদেশ। আর তোমাকেই বলি, আজিকার দিনে আমি সকলকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছি। জীবনের শেষ সময়ে সুকৃতিবলে বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম অনাদি অনন্ত ও অনায়ত্ত। ইহাতে কাহারও কোনও অধিকার নাই। জীব মাত্রেই প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন। স্বেচ্ছায় কোন কিছু করিবার শক্তি নাই, যে কর্ম্মে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি আসে না, তাহাই প্রাক্তন কর্ম্ম বিপাকে জীবমাত্রেই করিয়া থাকে। তবে আর দোষ দিব কাহাকে ? রাগ করিব কাহার উপর ? আমি যেমন কর্ম্মপাকে আবদ্ধ, সকলেই ত তেমনি। তাই আমি আজ এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধি সময়ে পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে বলিয়া যাইতেছি, ভাই, সকলকে বলিও আমায় যেন ক্ষমা করে। আর আমি সকলকেই— পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলকেই ক্ষমা করিলাম। আজই আমার সংসারাবদ্ধ জীবাত্মা মনোরমার গর্ভে আশ্রয় লইবে। কাল সন্ধ্যার পরে মনোরমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। সে সংশয়াকুল পীড়িত নির্যাতিত মন লইয়া জাহ্নবীর পূত সলিলে চির বিশ্রাম লাভ করিতে আসিবে। তাহাকে আত্মহত্যা হইতে

তুমি নিবৃত্ত করিবে।' তার পরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়াও মনে হইতে লাগিল, স্মৃতিতীর্থ যেন শিয়রে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 'বিশ্ব যেন আমায় ক্ষমা করে, আমিও—বিশ্বকে ক্ষমা করিলাম।' মনে হইতে লাগিল, যেন ঘুম ভাঙ্গে নাই। চোখ মুছিয়া আবার চারিদিকে চাহিলাম। তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কাহারও কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। ঘর যেমন অন্ধকার করিয়া শুইয়াছিলাম, তেমনই দেখিলাম। তার পর আলো জ্বালিলাম, তবুও মনে হইতে লাগিল যেন স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তেমনি ভাবে আমার সহিত কথা কহিতেছেন। আর ঘুম আসিল না। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিলাম না। গঙ্গাস্নানে আসিলাম। আজ সমস্তদিনই এই এক স্বপ্নই আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার মনে হয় এ স্বপ্ন মিথ্যা হইবে না। একটু পরেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আমি চলিলাম, আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" বলা বাহুল্য, এই বৃদ্ধ গাঙ্গুলীই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়,—মণিবাবুর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানজী।

১৩

সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল, অপরাহ্ণের জনতাও তেমনি ক্রমে ক্রমে কমিয়া ক্ষণপূর্ব্বের জনকোলাহলপূর্ণ ঘাট নীরব হইয়া আসিতে লাগিল। একে একে সকলেই চলিয়া গেল। বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় স্বপ্নের কথা ভাবিতে ভাবিতে অনিমেষ লোচনে ঘাটের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন এখনই কেহ আসিবে এমনই ভাবে অপেক্ষা

করিয়া বসিয়া রহিলেন। কতক্ষণ এ ভাবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল। আর বৃদ্ধ গাঙ্গুলী মহাশয় মনে মনে যেন মনোরমাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন 'এস মা—মনোরমা আমি যে তোমারই আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। তোমার পিতার স্বপ্ন-আদেশে যে আমি তোমারই অপেক্ষা করিতেছি। আয় মা মনোরমা, আয় মা, পুণ্যময়া পিতৃজননী আয় মা আয়।' মনের এ আকর্ষণে, এ আহ্বানে যে দেবতাও না আসিয়া পারেন না। তাই বুঝি মনোরমা আলুলায়িত কেশে—ত্রস্ত বসনে ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনোরমা এক এক ধাপ করিয়া ক্রমে শেষ ধাপে যাইয়া গঙ্গার সপ্তপাতকনাশিনী পুণ্য বারি স্পর্শ করিয়া বলিল—"মা গঙ্গা, আমার আর স্থান নাই, কর্ম্ম নাই, আমি সর্ব্বনাশী, সবই খাইয়া বসিয়াছি। পিতার অমতে, মাতার অজ্ঞাতে, আমার অজ্ঞানে আমার জীবন অপবিত্র করিয়াছি—শক্তিহীন হইয়া আমার ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারি নাই, তাই তোমার ত্রিতাপনাশিনী শ্রান্তি-ক্লান্তিহরা পবিত্র সলিলে আমার শত জ্বালা জুড়াইতে আসিয়াছি,—পতিতপাবনী আমায় কোলে স্থান দাও মা। আর যে জ্বালা সহ্য করিতে পারি না। এ যদি আমার আত্মহত্যা হয়—এত জ্বালার অপেক্ষাও যদি তোমার পবিত্র কোলে শেষ শয্যা চাহিয়া লওয়ার জ্বালা অপেক্ষা আমার এ আত্মহত্যার পাপের জ্বালা অধিক হয়, তবে আমি তাহাও সহ্য করিব। কিন্তু আমার এ কাল রূপের জ্বালায় যে জ্বালাতন হইয়াছি, ও দশের নিকট যে আরও হইব না এমন নহে, তাহা হইতেও যদি এই পাপের জ্বালা অধিক হয়, তাহাও আমি অকাতরে সহ্য করিব। কিন্তু মা আর যে পারি না, আমায় তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও মা।" বলিয়া

যেমন জলে ঝাঁপ দিতে যাইবে অমনি সেই বৃদ্ধ যেন দৈববলে যুবার বলে বলীয়ান্ হইয়া মনোরমাকে ধরিয়া বলিল, "মা, মনোরমা, আমি তোর পিতার আদেশে তোর জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। আয় মা মনোরমা, তোর বৃদ্ধ সন্তানের ঘরে আয় মা, আয়, তোর সবই আছে—তোর ধর্ম্ম আছে—তোর কর্ম্ম আছে। তোর যদি এ সব না থাকে, জগতে আর কার কি আছে মা। আমি যে তোর সন্তান—তুই যে আমার মা—তুই যে জগতের মা—তোর কি এ অভিমান সাজে মা। আমি তোর জন্যই এখনও যে বাঁচিয়া আছি। আমি যে সব ছাড়িয়া তীর্থে আসিয়া তোরই কাজের জন্য রহিয়াছি মা, এখনও কিছুদিন যে তোরই জন্য আমাকে থাকিতে হইবে। এ যে দেবাদেশ মা—এ না করিলে যে আমার মুক্তি হইবে না। সারাজীবন ভূতের বেগার খাটিয়া আসিয়াছি, এবার যে তোকে পাইয়া তোর কর্ম্মের সঙ্গে আমার ইহজীবনের পবিত্রতম কাজ করিব মা আমার! তোর নারীধর্ম্ম, তোর মাতৃধর্ম্ম যে সমাজের আদর্শ হইবে। তাহা না হইলে দেশ যে রসাতলে যাইবে, সনাতন ধর্ম্ম লোপ হইবে। তোর দশায় পড়িয়া যাহারা পথ হারাইতে বসিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা দিতে—তাহাদের পতিত জীবন উদ্ধার করিতে তোকে উপলক্ষ্য করিয়া পথ দেখাইবেন বলিয়াই যে ভগবান্ এমন অবস্থায় তোকে ফেলিয়াছেন মা। তোর শক্তিতে, তোর আদর্শে যে জগতের নারী—এই আদ্যাশক্তি মহামায়া নারী আবার নবশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। তোর কর্ম্ম আছে, তোর ধর্ম্ম আছে, আয় মা আয়। আমি যে তোর সন্তান, আমায় মা হারা করিস্‌নে মা। আমি যে দেবাদেশে তোর অপেক্ষা করিতেছি। তোর পিতার আদেশ তোর উপর কি আছে, তা যে তোকে বলিবার জন্য আমি আছি মা। তোর মত বুদ্ধিমতী নারীর, মায়ের কি মৃত্যু উপযুক্ত

মা—তোর সন্তান তোর জন্য হাহাকার করিয়া শূন্যে চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে; আর তুই এমনিভাবে এমনি অন্যায়কে আশ্রয় কর্‌বি, আত্মহত্যা কর্‌বি, এই কি কখনও হয় মা। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর কাহারও হাত নাই। নিয়তির উপর, গতজীবনের কর্ম্মের উপর—প্রাক্তনের উপর কাহারও হাত নাই মা। কিন্তু আগামী জীবনে—জন্মে সকলেরই হাত আছে। সে কর্ম্মের উপর—ইহজীবনের কর্ম্মের উপর পরজীবন গঠিত হয়। আর সে কর্ম্ম মানবের প্রবল পুরুষ-কারের আয়ত্ত। তাহা কেন নষ্ট করিবি মা। তোর চেয়ে কত অত্যাচার কত লোককে সহ্য করিতে হইয়াছে ও হইবে। তাই বলিয়া কি আত্মহত্যায় সব পথ—স্বর্গপথ, মুক্তির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবি, তা কখনও হইতে পারে না। এই জন্যই কি তোর পিতা তোকে সুশিক্ষা দিয়া-ছিলেন। যদি তোর বিদ্যাবুদ্ধির শক্তি এই বুঝিয়া থাকিস্, তবে বড়ই ভুল করিয়াছিস্। তোকে আমি মা বলিয়াছি, তুই আমার মা—একদিন হয় ত মাই ছিলি; নতুবা আজ এই আসন্ন সময়ে আমি কেন তোকে এই পাপ হইতে রক্ষা করিতে আসিব মা। আয়, মা আয়, তোর ধর্ম্মে, তোর কর্ম্মে জগৎ শক্তিশালী হইবে। আয় মা, তুই যে আমার মা, জগতের মা! তোর কি এ কাজ সাজে! এই রাত্রিতে তীর্থের সমস্ত দেবগণকে ডাকিয়া, তাঁহাদের মঙ্গল নাম স্মরণ করিয়া, আমি তোকে বলিতেছি, তুই নির্দ্দোষ, তুই অপাপ। তোর সবই আছে, তোর নারীধর্ম্ম অক্ষয়। তোর সবই আছে, তোর ধর্ম্ম আছে, তোর ধর্ম্ম আছে।"

সেই দ্বিযামা রাত্রিতে গঙ্গার পরপারের গঙ্গাগর্ভে দাঁড়াইয়া মেঘ-মন্দ্রে কে বলিয়া উঠিল—"তুই যদি অসতী—তুই যদি পাপী—তুই যদি

পাপ-তাপে জর্জ্জরিতা—তুই যদি ধর্ম্মহারা, কর্ম্মহারা, তবে এ জগতে সতী কে ? তবে জগতে পুণ্যবতী কে ? তবে এ জগতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মে আর কার অধিকার আছে। তোর সবই গিয়াছে—কিন্তু জীবন ধর্ম্মময় ও কর্ম্মময় হইবে। তুই কেন ভুলিয়া যাইতেছিস্ মা, তোর পিতা যে তোর একমাত্র সন্তান হইয়া তোর গর্ভে বাস করিতেছে। সে যে আবার আসিয়াছে—সে যে নবশক্তি লইয়া জগতে একটা মহৎ কাজ করিতে—জগৎকে কার্য্য শিখাইতে আসিয়াছে। তার জন্য অপেক্ষা কর মা, সময় ত যায় নাই, প্রত্যেকের শিয়রে যে মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছে। তার জন্য প্রস্তুত হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম কর মা। যা মা, পিতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, গোবিন্দের ন্যায়ই পুণ্যবান্ গঙ্গাগোবিন্দের আশ্রয়ে ;—সে তোরই অপেক্ষায় রহিয়াছে মা! তুই তার মা—তুই যে আমার মা—তুই যে জগতের মা।"

মনোরমা তাহার পর আর কোন কথাই শুনিতে পাইল না। কেবলমাত্র তন্দ্রার মধ্যে যেন দেখিতে পাইল, বুঝিতে পারিল, সে তো সত্যই বিশ্বের মাতা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন তাঁহাকে 'মা, মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছে। জীবজন্তু, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সকলেই যেন তাহাকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছে। সকলেই যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে বিশ্বমাতা ; বিশ্বই যে তাহার সন্তান। মাতৃ-আহ্বানের পুলকে শিহরণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, মনোরমা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া বৃদ্ধের কোলের উপর পড়িয়া গেল।

তারপর সেই বৃদ্ধ মনোরমাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আয় মা, আয়,—তোর ধর্ম্ম আছে—তোর কর্ম্ম আছে—তুই যে আমার মা, তুই যে জগতের মা।

১৪

শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাটের উপর একখানি দ্বিতল বাড়ীর উপরের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া মণিবাবুর বিমাতা ভবসুন্দরী দেবী একখানি পত্র পড়িতেছেন। পত্রখানি যতই পড়িতেছেন, ততই যেন চক্ষুতে অশ্রুর স্রোত বহিতেছে। সুদীর্ঘ পত্রের শেষ নাই, আর বিধবার অশ্রুরও নিবৃত্তি নাই। আজ আর তপজপে মন যাইতেছে না। সম্মুখে পূজার ফুলচন্দন শুকাইয়া যাইতেছে। যমুনার স্নিগ্ধ জলস্পর্শে যে মন্দ মন্দ বাহিত বায়ু বিশেষ সুখস্পর্শ হইয়া গৃহমধ্যে আসিয়া মনে সাত্বিক ভাব চিরদিন জাগাইয়া দিত, আজ সেও যেন পত্রের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়া, মর্ম্মস্পর্শী হইয়া পড়িয়াছে। কিছুতেই আর পত্র হইতে মন উঠিতেছে না। একবার দুইবার চেষ্টা করিয়া কতবার পত্রখানি শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মনের দারুণ অবস্থায় তাহা আর কিছুতেই শেষ হইতেছে না। অবশেষে ভবসুন্দরী পত্রখানি কোনরূপে শেষ করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর তৈলচিত্রের নিম্নে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছি, তাহারই পাপ আমাকে এখন—এই জীবনেই জড়াইতে বসিয়াছে। আমার এই ভুলের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তুমিই বলিয়া দাও। আমি না বুঝিয়া তখন তোমার কাজের উপর বিচার-বুদ্ধি আনিয়া দেশের ও দশের যে অনিষ্টের হেতু হইয়াছি—তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত তুমিই বলিয়া দাও। ওগো, আমার ইহ-পরজীবনের দেবতা—তুমি অভিমান করিয়া চির-মৌনী

হইয়া থাকিলে আমার যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব যায়। আমার সময় থাকিতে তুমি বলিয়া দাও, কি করিলে আমার কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। তখন বুঝি নাই, তুমি বহুদর্শী হইয়া অনেক ভাবিয়া—অনেক দেখিয়া—অনেক চিন্তা করিয়াই লোকের শত অনুরোধের বাধা সত্ত্বেও তুমি তোমার একমাত্র সন্তান—বংশের একমাত্র অবলম্বনকে এমন ভাবে ত্যাগ করিয়া পথের পথিকের মত করিয়াছিলে। তখন মনে হইয়াছিল, যাহাই করুক, সে যে আমার শ্বশুরের বংশধর, তাহার পৈতৃক-সম্পত্তি তাহার হাতে তুলিয়া দিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্যের শেষ হইবে। সে বিষয় হইতে, জমীদারী হইতে বঞ্চিত থাকিলে দশের উপর অত্যাচার করিতে, স্বেচ্ছাচারের স্রোত বহাইতে সে কখনই পারিত না। আমারই ভুলে সে এ সব করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন বল, আমায় কি করিতে হইবে। দেশের প্রধান প্রধান লোকে যে যুক্তি দিয়াছে, তাহাই কি আমি মাথা পাতিয়া লইব। বল আমায় তুমি বল, আমায় কি করিতে হইবে; আমি যে বুদ্ধি বিবেচনা সবই হারাইয়া তোমারই শরণ লইয়াছি। তোমার চিন্তা করিবার জন্য এই পবিত্র তীর্থের এক প্রান্তে পড়িয়া আছি। আমার বুদ্ধি-বিবেচনা কতটুকু তাহা ত তুমি জানিতে। আমার ক্ষমতা জানিয়াও কেন অপরাধের বোঝা আমার মাথায় তুলিয়া দিয়া তুমি সরিয়া পড়িলে। আমি যে আর পারি না, তুমি সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট চিরমুক্ত হইবে, আর আমি অপরাধের পূর্ণ বোঝার ভারে নত হইয়া নরকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কতকাল আর এভাবে কাটাইব। ওগো আমার সর্ব্বস্বদেব, তুমি এর বিচার কর। তোমার বিচারে যাহা হইবে, আমি আনন্দে তাহাই মাথা পাতিয়া লইব।" আর কিছু বলিতে না পারিয়া সেই উপবাসক্ষীণা ব্রতপরায়ণা বিধবা কাঁদিয়া

উঠিলেন। কতক্ষণ পরে নিজে সংযত হইলেন। পূজার আসনে বসিয়া কোনরূপে পূজা শেষ করিয়া পুষ্পপাত্রের যাবতীয় ফুলে চন্দন মাখাইয়া দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আরাধ্য দেবতাকে অঞ্জলি দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ক্ষুণ্ণ মনের—ক্ষুণ্ণ প্রাণের অঞ্জলি বলিয়া তুমি যেন ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হইও না। আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর দেব! আমার মনে শান্তি দাও—আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে শক্তি দাও!"

মণিবাবু কাশী হইতে বাড়ী ফিরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গদের দলে মিশিয়া একবার মহল পরিদর্শন অছিলায় নিজের জমীদারীর উপর একটানা ঝড়ের মত যে অত্যাচারের স্রোত বহাইয়া আসিলেন, তাহাতে দেশের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। টাকার গদিতে বসিয়া যাহারা দেশে বাস করিতেছিল—যাহাদের মহাজনী ব্যবসা ছিল, তাহারাও মণিবাবুর নামে ভয় খাইতে বাধ্য হইল। এরূপ ভয়াবহ চক্রান্তের সৃষ্টি হয় নাই, যাহাতে মণিবাবু লিপ্ত হইতে না পারেন। দেশের মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কেই মণিবাবু একটু ভয় বা ভক্তির চক্ষে দেখিতেন,— তিনিও যখন আর দেশে আসিলেন না, এবং তাঁহার বেতন বা তঙ্কা বন্ধ হইয়া গেল, তখন আর উপায় কি? তাই দেশের গণ্যমান্য ভদ্রলোক সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া একখানি পত্রে মণিবাবুর অত্যাচার-কাহিনী বিস্তৃত করিয়া লিখিয়া একজন প্রবীণ সুদক্ষ অথচ কর্ম্মঠ লোককে ভবসুন্দরী দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ সেই লোক বৃন্দাবনে আসিয়াছে ও ভবসুন্দরীকে পত্রখানি দিয়াছে। সে পত্রে অনেক কথাই লেখা ছিল - সব কথায় আমাদের দরকার নাই, তবে তার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

"মা, আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়া আজ আপনাকে বিরক্ত করিতে

বাধ্য হইয়াছি। আমাদের বিপদের কথা জ্ঞাত হইয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা যে কি বিপদে পড়িয়া, আজ আপনার তীর্থবাসের বিঘ্ন ঘটাইতে বসিয়াছি—তাহা যতদূর সম্ভব পত্রে লিখিতেছি। মা আমরা আপনার সন্তান, আপনি সেই চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই—আজও আমরা এই সুদূর-বঙ্গের ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়াও আপনার নিকট আশ্রয়-ভিক্ষা করিতে সাহসী হইয়াছি। স্বর্গীয় বাবুর সময়ে আমরা রাজা প্রজা সম্বন্ধে মাত্র খাজনা দিয়া আসিয়াছি; তারপর অপর কোনও বিষয়েই তিনি কখনও আমাদের কোনও অধিকারে বঞ্চিত করেন নাই, বরং পিতার মত—বন্ধুর মত—বিপদের হাত হইতে আমাদিগকে চিরদিনই রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন মা আমাদের সে দিন নাই—এখন আমরা যেন মণিবাবুর ক্রীতদাস হইয়াছি। আমাদের মান-সম্ভ্রম কিছুই নাই। আমাদের উপর পশুর ব্যবহার হইতেছে। খাজনা দিয়াছি—রসিদ আছে—বাবুর শীলমোহর রসিদ, তাঁর সময়ের দলিল প্রভৃতি সবই যাহা আমাদের মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া এতদিন যত্নে রাখিয়াছিলাম, আজ সেই সবই বাতিল—না-মঞ্জুর হইতেছে। দো-কর খাজনা আদায় হইতেছে—বাবুর নূতন নূতন বাজে খরচের টাকা আমাদের উপর চাঁদা হইয়া উঠিতেছে। আর যে তাহা না দিতেছে, তাহার সম্মুখে তাহার বাড়ীর মেয়েদের অপমান করা হইতেছে, তাহার ঘর জ্বালাইয়া শ্মশান করা হইতেছে। বাবুর সঙ্গী সব মাতাল—তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই, তাহারাই এখন মহলের কর্ত্তা। তাহাদের সঙ্গদোষে পড়িয়া, আমাদের দেবতার মত বাবুর বংশধর মণিমোহনবাবু যে কি হইয়াছেন, তাহা আর কি বলিব। ভয়ানক অত্যাচারের ফলে কত নিরীহ লোক দেশত্যাগী হইয়াছে—তাহাদের কত যুগের পৈতৃক বাস্তু ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আবার

কত শত বাল-বিধবার উপর কত অত্যাচার হইয়াছে ও হইবে, তাহার ঠিক নাই। এইরূপে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহারও সীমা নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক চক্রান্ত করিয়া আমাদের গ্রামের সর্ব্বপ্রধান কুলীন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ জয়রাম স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছে। আমরাও প্রথমে এ চক্রান্ত বুঝিতে পারি নাই। আজ এক বৎসরের পরে সে কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ ভীত হইয়াই আপনাকে জানাইতেছি। তাঁহার কন্যা মনোরমাকে মণিবাবু জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার এখন শোনা যাইতেছে, সেই মনোরমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় যে রাখিয়াছেন, বা সে কোথায় আছে, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের ভাই অভিরাম মণিবাবুর প্রথমে একমাত্র যুক্তিদাতা ছিলেন। এক বৎসর পরে মণিবাবু দেশে আসিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন, তাঁহাকেও দেশত্যাগী করিয়াছেন। এইরূপে নানা অত্যাচারে দেশে বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এত বড় জমীদারের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে যাইব, সে সাহস আমাদের কাহারও নাই। তাই মা, আমরা নিরুপায় হইয়া আপনার নিকট লোক পাঠাইতেছি। আপনার বিবেচনা যাহা হয় করুন। মণিবাবুর উপর যদি সব ভার দিয়া, আপনি আমাদের এভাবে মারিতে চান, তবে মা আমরা আর কোথায় আশ্রয় পাইব! তাই আমরা সকলে একমত হইয়া আজ হইতে স্থির করিয়াছি যে আর মণিবাবুকে জমীদার বলিয়া স্বীকার করিব না। কর্ত্তা মহাশয় ত আপনার হাতেই আমাদের দিয়া গিয়াছেন;—আমরা আপনাকেই জানি, আপনাকেই আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।

"বৃদ্ধ দেওয়ানজী মণিবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গদের দ্বারা নানাপ্রকার

অপমানিত হইয়া শেষ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর কেহই আর দেশে নাই, সকলেই তাঁহার সঙ্গে বিদেশে। আর আমাদের সাহায্য করিতে, আমাদের মুখ চাহিতে কেহ নাই। আপনি একবার মাত্র দেশে আসিয়া আমাদের অবস্থা দেখিয়া যান। আপনি যদি আমাদের এ অবস্থা এ দুর্গতি দেখিয়া এদেশে বাস করিতে বলিতে পারেন, আমাদের দুর্দ্দশায় আপনার চক্ষুতে জল না আসে, তবে আমাদের বলিবার আর কোন কথা নাই। মা, আমরা আপনার অবোধ সন্তান, আমাদের যথাযথ অবস্থা জানাইয়া যদি আপনার প্রাণে দুঃখ দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের ক্ষমা করিবেন।" ইত্যাদি শত-শত কাকুতি-মিনতি—শত শত অত্যাচার-কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া পত্রখানি ভবসুন্দরী দেবীর নিকট আসিয়াছে। আজ সেই পত্র পড়িয়া ভবসুন্দরী দেবী বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ভবসুন্দরী দেবী শেষে স্থির করিলেন, তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। তবে মণিমোহনের হস্তে পড়িয়া যাহাতে দেশের ও দশের এমন অনিষ্ট না হয়, তাহার উপায় করিতেই হইবে। যে লোক পত্র লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিল, তাহাকে বলিয়া দিলেন—সে যে কোনও উপায়ে কাশীতে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই পত্রখানি দেয় ও তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেয়। তিনি আসিলে এই বিষয়ের যাহা কর্ত্তব্য, স্থির করিবেন। আরও বলিয়া দিলেন, ইচ্ছা করিলে সে দেওয়ানজীর সহিত পুনরায় বৃন্দাবনে আসিতে পারে। এ সব ব্যয়-ভারও তিনিই বহন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া সব ঠিক করিয়া রাখিবেন। মণিমোহন তাঁহার পুত্র বলিয়া যে কাহারও উপর অত্যাচার করিবে, তাহা তিনি কখনই সহ্য

করিবেন না। বিচারে মণিমোহনের যে শাস্তি হওয়া উচিত তিনি তাহা দিবেনই। সে শাস্তি যদি সে মাথা পাতিয়া না লয়, তবে তাঁহার জমীদারী তিনি সাধারণের হাতে তুলিয়া বলিয়া দিবেন যে, তাহাতে দেশের দীনদুঃখীর সেবা হইবে। স্বর্গীয় বাবুও তাঁর অন্তিম সময়ে এই আদেশই করিয়াছিলেন।

১৫

অভিরাম তর্কতীর্থ ভাবিয়াছিলেন, জমীদার জামাই হইলে আর খাটিয়া খাইতে হইবে না। রাজার হালে দিন কাটিয়া যাইবে। আর মণি-বাবুই না সেই প্রকার আশায় মুগ্ধ করিয়াই তাঁহাকে এ সব ব্যাপারে নিয়োগ করেন! কিন্তু মানুষের ভাগ্যে যে সবই উল্টা হইয়া যায়, তাহার উপায় কি?

বিবাহের পরই মণিবাবু মনোরমাকে লইয়া দেশান্তরী হন। তাহার পর আর দেশে কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই। এদিকে লোক-পরম্পরায় তর্কতীর্থের বিদ্যার দৌড় দেশময় প্রচারিত হইতে কালবিলম্ব হইল না। তখন তাঁহার শিষ্য-যজমান সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আর এদিকে মণিবাবু সদরে উপস্থিত না থাকায় তাঁহার পার্শ্বচরদিগের নিত্য নবলীলার মধ্যে তর্কতীর্থ নিজের স্থান বাছিয়া লইতে না পারিয়া, কর্ণধারহীন নৌকা বায়ুতাড়নে যেমন ভাসিয়া বেড়ায়, তেমনি তিনিও নিজের দুর্ভাগ্যের বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবস্থার নানাপ্রকার বিপর্য্যয়ে পড়িয়া দশের হস্তে তাঁহার যতই নির্যাতন হইতে লাগিল, তিনি ততই মণিবাবুর উপর জাতক্রোধ

হইয়া কি উপায়ে ইহার প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। আসন্ন বিপদের মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ভয়ার্ত্ত যেমন করিয়া জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়, তেমনি ভাবেই মণিবাবুর মহলের সর্ব্বসাধারণ প্রজায় দিন কাটাইতেছিল। যে সময় সকলে মিলিয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়া বৃন্দাবনে লোক পাঠাইয়া ভবসুন্দরীর নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন, সেই সময় মণিবাবু দেশে ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথমে তর্কতীর্থকে অনেক সন্ধানের পর বাহির করিয়া নানাপ্রকারে অপমানিত করিতে লাগিলেন। মদোন্মত্ত মণিবাবু একদিন কাছারীর সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন,—“দেখ, এই লোভী ব্রাহ্মণটা যদি আমার কুকর্ম্মের ইন্ধন না যোগাইত, তাহা হইলে আজ আমার এমন অবস্থা হইত না। আমি ত অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু আমার সকল কর্ম্মের মন্ত্রণাদাতা এই ভণ্ড ব্রাহ্মণ। ভাইয়ের উপর প্রতিহিংসা লইতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে যেন ভোজ-বিদ্যার মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে ও আমাকে একেবারে ভস্ম করিয়া দিয়াছে। আহা বেচারা পরিণাম না বুঝিয়া সাপ পুষিয়া—বাঘ ভালুক পুষিয়া তাহার বাড়ীময় ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাই না এমনটা হইল। কিন্তু এ যে সকলের সেরা জীব; এর মধ্যেই সর্ব্ব জাতির সর্ব্বকর্ম্ম অন্তরে অন্তরে নিহিত আছে, তবে মানুষের দেহের আবরণে। মানুষ সাপ, মানুষ বাঘ, মানুষ হিংস্র শ্বাপদ, মানুষের মধ্যে বাছিয়া লইতে বড় দেরী পড়িয়া যায়। সাপ দেখিয়া, বাঘ ভালুক দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় তার কি কাজ। কিন্তু ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে যে শ্বাপদ আছে, তাহা কর্ম্ম ভিন্ন বাছিয়া লইবার উপায় নাই বলিয়াই পৃথিবীতে যত কিছু বিপদের সূচনা। এই আমিই না

একদিন জন্মদাতা পিতার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব সবলে ছিন্ন করিয়া লইয়া দশের মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলাম। আবার আজ আমিই না সেই সব অতিকষ্টে অর্জ্জিত সুনামের মুখোস পরিয়া দেশে আসিয়া শয়তানের চরম কার্য্য করিতেছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি আর এই জমীদার আমি—এই দুটোকে সামনাসামনি ক'রে দেখ কোন্‌টা মানুষ—আর কোন্‌টা পশুরও অধম—সাপের চেয়েও খল—বাঘের চেয়েও শোণিতলোলুপ—অথচ সিংহের মত পরাক্রমশালী। আর এই তফাৎ হইবার উপলক্ষ কে?—কে আমাকে এমন ক'রে দিলে, আমাকে মানুষের দল হইতে কে পশুর দলে নিয়ে গেল, তা তোমরা জান কি? তোমরা, এই তোমাদের মত মূর্খেরা বল্‌বে—তোমার ভাগ্য—তোমার অদৃষ্ট—তোমার প্রাক্তন। কিন্তু আমি তা মানি না; তাদের আমি কখনও চোখে দেখিনি, তাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমি স্বীকার করিতে চাহি না। আমি বল্‌বো আমার দুষ্ট গ্রহের সেরা প্রতিহিংসার পূর্ণ জীব, আমার ভাগ্যের ঘর অন্ধকার নরক—এই ভ্রাতৃদ্রোহী—কন্যাঘাতী নিষ্ঠুর ক্রূর—ক্রিমিকীটের অধম বিশ্বশত্রু ব্রাহ্মণটা। তুই না একদিন আমার অতি আত্মীয়ের রূপ ধ'রে এসে আমার মনের মধ্যে মনোরমার সৌন্দর্য্য এঁকে দিয়েছিলি,—তুই না একদিন বলেছিলি যে, সে দেবীপ্রতিমার চেয়েও সুন্দরী; এমন ভাস্কর নেই যে, তেমন মূর্ত্তি গড়তে পারে। আর তুই না আমায় অতি নিভৃতে নিয়ে গিয়ে—তোরই বাড়ীর মধ্যে বসিয়ে—তোর কন্যার—কন্যারই তো—তুই না তার কাকা—তোর নিজের সহোদর ভাইয়ের মেয়ে না সে—তাকে—সেই মনোরমাকে—না না—মনোরমাকে নয় তার—সেই অপরূপ রূপরাশিকে আমায় দেখিয়েছিলি। তুই না আমার ক্ষুধিত উন্মত্ত যৌবনের সামনে—সেই

অপরূপ রূপের লাবণ্য বলি দিয়েছিলি। আমার কামের ইন্ধন যোগাড় ক'রে দিয়ে আমার তার—আমাদের সকলের সর্ব্বনাশের পথে যাবার প্রথম পথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলি। আমি আজ কেন দিনরাত মাতাল, তা তোমরা কেউ জান না। আর মাতাল যে লোকে কেন হয় তাও জান না। আমার মনে হয় অতি দুঃখে মদ সান্ত্বনা—অতি আনন্দে মদ আনন্দ; লোকের উৎসবে মদ—লোকের দুঃখে মদ। লোকে মদ খায় না, মদে লোক খায়—এটা বুঝ. যে একবার মদ ছোঁবে—শাস্ত্রে যাকে বলে, স্পর্শ করবে—মদ তাকেই পেয়ে বসবে। আমি চিরদিনই এমন ছিলাম, তা ত নয়। জান ত তোমরা, কিন্তু যেমন ঐ শূয়ার বেটাকে স্পর্শ করেছি, অমনিই সে আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি কেন স্বেচ্ছায় এই বিষ পান করেছি—কণ্ঠে ধরেছি, মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি, জান? তোমরা কি জানবে—কিছুই জান না। তবে শোন, দুনিয়াকে ভুলতে—দুনিয়ার সেরা মনোরমাকে—না মনোরমাকে নয় তার রূপকে,—যাকে আমি পেয়েছিলাম তাকে। তাকে পাই নি, কোন দিনই পাব না এটা বুঝেও—তার রূপকে আমি হাতে পেয়েও ছাড়ি কি ক'রে? সে তার রূপ আমার পায়ে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেনি। সে যে তার বিবাহই হয়েছে ব'লে জানত না। যখন বিবাহ হয়—যখন বিবাহের অভিনয় চলছিলো, তখন সে একট্রেশ হলেও অজ্ঞান হয়েছিল—তাই সে জানতো না যে তাকে আমি বিবাহ করেছি। আর তার পরম পূজ্য, এই খুল্লতাত তাকে দান করেছে। তাই সে আমাকে স্বামী ব'লে স্বীকার করে নি। এই কয়টা মাস—প্রায় দেড়টা বছরের মধ্যে তাকে কথা বলাতে পারি নি, সে যেন বোবা—কালা। একটা রূপের জড়-মন্দির; পাথরের ছবি বাগানের মধ্যে

যেমন দাঁড় করানো রয়েছে—এমনই সে ছিল। একদিন মাত্র কথা কয়েছিল; বলেছিল—'আমি তোমার অস্পৃশ্য, তুমিও আমার অস্পৃশ্য। ব্যস্', দু' মিনিটে সেই বাঁশীর স্বর থেমে গেছলো। তাই ত আমি পশুর অধম হ'য়ে—শয়তানকে ডেকে এনে আমার উপর ভর করিয়ে তার সৌন্দর্য্যকে—তার রূপের রাশিকে—সেই ফুটন্ত পদ্মবনকে মত্ত হস্তীর ন্যায় পদদলিত ক'রে, সর্ব্বলোকের অস্পৃশ্য ক'রে ফেলে দিয়েছি—ত্যাগ ক'রে চলে এসেছি। তাকে আমি পাই নি,—তার রূপকে সে আমায় স্বেচ্ছায় দেয় নি;—কিন্তু এই—এই শাস্ত্রজ্ঞানী কপটাচারী যে আমার হাতে সেই মূর্চ্ছাতুর মাংসপিণ্ডটা তুলে দিয়েছিল—বিবাহের সময় মন্ত্র পড়তে পড়তে দান-বাক্য ব'লে আমায় দান করেছিল—ও কি আমায় মনোরমাকে দিয়েছিল—না, না—সে তখন কোথায়? আমাদের শুভদৃষ্টিই হয়নি—তখন সে মূর্চ্ছার মধ্যে। তবে ও দিলে কাকে—ওরে পাজী নচ্ছার হারামজাদ শূয়োর, তোর সঙ্গে আমার কি সর্ত্ত ছিল—তুই না আমায় বলেছিলি যে মনোরমাকে আমায় দিবি—তাই না তোকে তখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। পরে আরও দেবো ব'লে স্বীকার করেছিলাম। কিন্তু কই, আমি তো মনোরমাকে পাই নি—তুই তো তাকে দিস্ নি—তুই যে একটা প্রাণহীন মাংসপিণ্ড আমাকে দিয়েছিলি। আমার সঙ্গে পুরাদস্তুর শয়তানী করেছিস্—আমার মত একটা উন্মাদকে নিয়ে তুই যেমন ব্যবসা চালাতে ইচ্ছে করেছিলি—তেমন তার উপযুক্ত ফলভোগ কর—এইখানেই তোর ব্যবসা শেষ হ'ল।" এই বলিয়া সেই উন্মত্ত মাতাল মণিমোহন অভিরাম তর্কতীর্থকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। একটা শব্দ হইল, তাহার পরই তর্কতীর্থের লীলাখেলা শেষ!

১৬

পত্রবাহক কাশীধামে আসিয়া দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভবসুন্দরীর পত্রখানি দিল। পত্রে ভবসুন্দরী দেওয়ানজীকে লিখিয়াছিলেন,—"বাবা, বহুদিন আপনার কোন সংবাদ লইবার সুযোগ পাই নাই, তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। আজ বাধ্য হইয়া আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে নানা বৈষয়িক গোলযোগের মীমাংসার জন্য আপনার দ্বারস্থ হইবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে একবার এখানে আসিতে অনুরোধ করি। আমার বিশ্বাস, আমার উপর আপনার চিরদিনের স্নেহ মমতা এখনও নষ্ট হয় নাই। আপনিই যে আমাকে আমার শ্বশুর-গৃহের বধূরূপে বরণ করিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন; আমি আজও সে কথা ভুলিতে পারি নাই। আমার শ্বশুরবংশ আজ ব্রহ্মশাপে—দেশের অভিসম্পাতে একেবারে ভস্ম হইতে বসিয়াছে। আপনিও বোধ হয় আপনার আজীবনের যত্ন-রক্ষিত আমার শ্বশুর-গৃহ হইতে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইয়াই শেষ বয়সে তীর্থে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাহা হউক, যাহাতে আমার জীবদ্দশায় আমার স্বামীর কীর্ত্তি ও বংশ একেবারে লোপ না পায়, তাহার জন্য আমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর আপনিই যে আমাকে সেই মত উপদেশ দিতে পারেন ও আমার অনুরোধে সেই সব রক্ষা করিতে পারিবেন, আমার সে বিশ্বাস এখনও আছে। তাই আমি এই সুদূর তীর্থে জীবন যাপন করিতে আসিয়াও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া

আজ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। মণিমোহন যে অত্যাচারী হইয়া নিজের ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতে সাহসী হইবে, আমি যদি ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত শীঘ্র আমি তীর্থে আসিতে পারিতাম না। আমি আসিবার সময় মণিমোহনকে একমাত্র অনুরোধ করিয়া-ছিলাম যে, সে যেন সংসারী হয় ও বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়া আমাকে দেখাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু আমার শেষ অনুরোধও সে রক্ষা করে নাই। আর সে যেভাবে একজনের সর্ব্বনাশ করিয়া পিতার অমতে তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, সে ভাবে আর কেহ কখনও বিবাহ করিয়াছে কিনা জানি না। তবে সে যাহাকে বিবাহ করিয়াছে, যেভাবেই বিবাহ করুক, তাহার বিবাহিত পত্নীই আমার স্বামীর গৃহের একমাত্র বধূ—গৃহলক্ষ্মী। আমি তাহাকে আমার গৃহে স্থান দিবই, আমার গৃহই—আমার স্বামীর গৃহই—তাহার শ্বশুরের গৃহ। তাহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করিতে হইবে।"

যথাসময়ে পত্রখানি পাইয়া দেওয়ানজী স্থির করিলেন, যে লোক পত্র লইয়া আসিয়াছে, তাঁহাকেই উপস্থিত সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা মাস দুই পরে যাইবেন। এ অবস্থায় মনোরমাকে লইয়া যাওয়া কোনরূপেই নিরাপদ নহে। পত্রে মনোরমার সকল অবস্থাই লিখিয়া দিলেন। এমনও লিখিয়া দিলেন, পুত্র হউক, কন্যা হউক, তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

মনোরমা দেওয়ানজীর মুখে সমস্ত শুনিয়া কোনও প্রকারেই সেখানে যাইতে সম্মত হইল না। অধিকন্তু মনোরমা বলিল—"আমি আমার জীবনে কোন প্রকারেই এই বংশের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ স্বীকার

করিতে পারিব না। আমার পরে যে থাকিবে, তাহা হইতে যেন এই অপবিত্র স্মৃতির ও বংশের শেষ হয় এবং তাহা হইতেই যেন আমার পিতৃকুল উদ্ধার হয়। আমার আর বেশী বলিবার কিছু নাই।"

মনোরমা যথাসময়ে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। এত দুঃখের পরেও সেই চিরদুঃখিনী পুত্রমুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিতে পারিল না। পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহার শত দুঃখ মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গত জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মই যেন তাহার পুত্ররূপ ধরিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—এমনই মনে করিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া তাহার বাপের প্রতিকৃতি, মুখ-চোখ লইয়া যে সন্তান হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া মৃত পিতার সকল অবস্থার কথা মনে করিতে করিতে বার বার শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। শতচেষ্টা করিয়াও কেহই তাহার সেই মর্ম্ম-বেদনার উপর শান্তির প্রলেপ দিতে সমর্থ হইল না। কোনরূপে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই জন্মদুঃখিনী নারী সূতিকা-গৃহের মধ্যেই আসন্ন মৃত্যুর করাল গ্রাসে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল। জানি না সেখানেও মণিমোহনের মত কেহ আবার তাহার রূপমুগ্ধ হইবে কি না। জানি না আবার তাহার মৃত পিতার প্রেতাত্মা তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আবার জন্ম লইতে বাধ্য হইবে কি না। যে আসিল, সে চিরজীবন তপস্যা করুক, পিতা স্বেচ্ছায় কন্যার গর্ভে পুত্ররূপে আসিয়া নবজীবনে তাহার উদ্ধার করুক, এ কর্ম্মের শান্তি করুক; যদি প্রবল পুরুষাকারে ইহা পারে, তবেই ত সকলের উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হইবে; এইখানেই তাহাদের সব শেষ হইবে। নতুবা অনন্তকাল ধরিয়া এই ভয়ঙ্কর কর্ম্মবীজ কোন অন্ধ-নরকের সঙ্গে নূতন নরক সৃষ্টি করিয়া সনাতন পদ্ধতির উপর মালিন্য আনিবে, তাহা কে নির্দ্দেশ করিবে?

দেওয়ানজী তীর্থে আসিবার সময় মনে করিয়াছিলেন, এইবার সকল বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিব। ঈশ্বর-চিন্তায় জীবনের শেষ কটা দিন কাটাইয়া দিব। এখন দেখিলেন ইচ্ছামত আর এক পাও চলিবার উপায় নাই। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—যিনি সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা, যিনি ইচ্ছার ইচ্ছা—তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কার শক্তি যে স্বেচ্ছায় কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে পারে। এখন দেখা যাক্, তিনি কোন্ পথে আমায় লইয়া যাত্রা করেন—আর কোথায় এই যাত্রার শেষ হয়। আর কখনও বলিব না যে প্রভু আমায় অবসর দাও। তোমারই ইচ্ছায় সব হউক। হে প্রভু, হে কর্ম্মরূপী বিরাট্ অনন্ত অব্যয় পরমপুরুষ, আমার এইমাত্র প্রার্থনা, যেন সব সময় মনে থাকে যে তোমারই ইঙ্গিতে, আদেশে তোমারই কাজ করিতেছি। ফলাফল তোমারই; আমার যেন কখনও কোন কর্ম্মে আসক্তি অনাসক্তি না আসে। আমি সব সময় সকল অবস্থার মধ্যেও যেন বলিতে পারি,—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

১৭

যখন মণিবাবুর শেষ কীর্ত্তি, অভিরাম তর্কতীর্থকে হত্যা করার সংবাদ ভবসুন্দরী দেবীর কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি আর কোনও প্রকারেই স্থির থাকিতে না পারিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে আসিতে বাধ্য হইলেন। দেশে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিজ হস্তে সাজান সংসার—প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর ঠাকুরদালানের মত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সারা গ্রামখানির অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। গ্রামে দুই পাঁচজন এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সকলেই অতি হীন অবস্থায় পড়িয়া—শত

লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া— অক্ষমের প্রতি সুবিচারের প্রার্থনার আশায় পড়িয়া আছে।

দুই চারি দিন মধ্যে দেশে দেশে মহলে মহলে প্রচার হইয়া গেল যে, মণিবাবুর দ্বারা যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত বা অন্যায়রূপে লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহারা যেন জমীদার-বাড়ীতে আসিয়া কর্ত্রীর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়।

অনেকগুলি ভয়াবহ ঘটনা শুনিয়া ভবসুন্দরী দেবী স্তম্ভিত হইয়া মণিবাবুর বিচার-ভার দেশের লোকের উপরেই নির্ভর করিলেন। আট দশ খানি গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ আসিয়া স্থির করিলেন যে, সরকারের হাতে এই অত্যাচারের বিচার-ভার তুলিয়া দিলে প্রমাণের মুখে আইনের বিচার হইবে মাত্র। কিন্তু তাহাতে দেশের লোকের ক্ষতিপূরণের কোন আশা করা যায় না। তাই সকলে একমত হইয়া স্থির করিলেন যে, ভবসুন্দরী দেবীর দয়ায় মণিবাবু তাঁহার পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছেন ও সেই শক্তিতে দেশের উপর এমন দুর্ব্যবহার করিতে সাহস পাইয়াছেন ; তাঁহার সেই অধিকার কাড়িয়া লওয়া হউক। স্বর্গীয় জমীদার মহাশয় তাঁহাকে যেমন ত্যজ্য পুত্র করিয়াছিলেন—তিনি সেই ভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত করুন। পৈতৃক বাড়ী ঘর বিষয়-সম্পত্তিতে তাঁর কোনও স্বত্বই নাই। তিনি যেমন বংশের ত্যজ্য— তেমনই সমাজের ও দেশের নিকট চির-ত্যজ্য হইয়া এ দেশ ত্যাগ করুন। যদি তিনি সাধারণের এই আদেশ অমান্য করিয়া কর্ত্রীর উপর বা মহলের উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব করিতে আসেন বা সরকারের নিকট কোনও প্রকার কৃত্রিম অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সকলকে ব্যস্ত করেন, তাহা হইলে হত্যাপরাধে অপরাধী মণিমোহনকে সত্বর ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

তর্কতীর্থকে খুন করার পর হইতে মণিমোহন আর ঘরের বাহির হন

নাই। সেই দিন হইতে প্রায় মাসাবধি কাল বাড়ীর মধ্যে এক অন্ধকার গৃহে—অতি নিভৃতে দিন কাটাইতেছিলেন। বাহিরের কোনও কথাই এ যাবৎ কেহ তাঁহাকে বলে নাই, আর তাঁহার শুনিবারও ইচ্ছা নাই। এমনই ভাবে যদি মণিমোহনের জীবনের শেষ কয় দিন কাটিয়া যাইত—লোকের নিকট আর মুখ দেখাইতে না হইত, তাহা হইলে মণিমোহনের পাপের শাস্তি বড় কম হইত না। মণিমোহনের বিচার সাধারণে যে ভাবে করিলেন, তাহা যখন সে জানিতে পারিল, তখন তাহার মনে হইল—আমার এই অন্ধকার-গৃহে নির্জ্জনবাস—ইহাতেও কি আমার পাপের শাস্তি হইতেছে না। আমার পাপ কি এতই বেশী! পাপ কি পুণ্য, মন্দ কি ভাল, এ সব বিচার করিয়া কখনও ত কোনও কাজ করি নাই;—আজই বা দশের কথায় আমার মনে সে চিন্তা আসে কেন? যখন যাহাতে আত্মতৃপ্তি বোধ করিয়াছি, তখনই তাহা করিয়াছি। আজ আমার সে শক্তি কোথায় চলিয়া গেল? আমার সে শক্তি কে কাড়িয়া লইল? আমার সে তেজ—সে দম্ভ—সে প্রবৃত্তি কোথায় গেল? আমি যেমন ভাবে আমার নিজ বুদ্ধি-চালিত হইয়া চলিয়াছি—আজ আর তাহা নাই। কেন নাই—কোথায় সে সব? আমি ত চিরদিন এমনই ছিলাম না;—আমার নিজের উপর আমার যে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি পনর বৎসর বয়সে অতি নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশে গিয়া দশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য হইয়া বাস করিতেছিলাম; এখন আর সে আমি নাই। তখন ত আমার এ সব ভয় ভাবনা—চিন্তা ছিল না। আজই বা সে সাহস সে তেজ নাই কেন? আমি ত কখনই আমার পৈতৃক বিষয়ের আশা করি নাই। এই পাঁচ ছয় বৎসরে আমার এত পরিবর্ত্তন হইল কিসে? তখন হেলায় ত্যাগ করিয়াছি; আজ অপরাধীর

আসনে দাঁড়াইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিতে এত কষ্ট হইতেছে কেন? যাহার জন্য আমার এই পরিণাম, আজ সেই বা কোথায়? রূপের মোহে পড়িয়া যাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়াছি, যাহার জীবনকে ভস্মে পরিণত করিয়া দিয়াছি;—বিবাহিত স্ত্রী জানিয়াও যাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পথের কাঙ্গালিনীর ন্যায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আজ বিধিবিপাকে আমারও সেই অবস্থা সাধারণের নিকট হইতে বসিয়াছে! কত লোকের সাজান বাগান শুকাইয়া দিয়াছি;—কত লোকের শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া শ্মশানে পরিণত করাইয়াছি; কত শত সুন্দরী নারীর উপর পাশবিক ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে কুলের বাহিরে আনিয়া পথের ধূলার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি! আজ কাহার ইঙ্গিতে—আদেশে—কাহার ন্যায় বিচারে সেই সবই একা আমার উপর প্রতিশোধ লইবে? যাহাদের চিরদিন হেয় মনে করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহারাই বিচারকের আসনে বসিয়া আমার কর্ম্মের বিচার করিতেছে! আমাকে গৃহহারা, বংশছাড়া করাইয়া দেশ হইতে চিরতরে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতেছে। আমি ভগবান্ জানি না, মানি না। কখনও চোখে দেখিব যে, সে বিশ্বাসও করি না;—কেহ কখনও তাঁহাকে চোখে দেখিয়াছে, তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এ কি?—আমার কৃত কর্ম্ম আজ আমাকেই শত বিভীষিকা দেখাইতেছে কেন? আমি লোকের উপর যে ব্যবহার করিয়াছি, আজ লোকের সেই ব্যবহার আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে কেন? কে প্রধান?—কর্ম্ম প্রধান, না কর্ম্মী প্রধান,—না কর্ম্মফল প্রধান?

পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে মণিমোহন মুখোপাধ্যায় অন্ধকার নিভৃত-গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া কেবলই বলিতে

লাগিল—"আমায় কে বলিয়া দিবে,—কে প্রধান? কর্ম্ম, না কর্ম্মী—না কর্ম্মফল!"

মণিমোহন সেই যে চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ ছাড়িয়া পাগ্‌লা কুকুরের ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করিল—তাহার কোথায় নিবৃত্তি হইবে,—কে নিবৃত্তি করিবে,—তাহা কে বলিবে?

১৮

ভবসুন্দরী দেবীর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে বার বৎসর পরে কাশীধাম হইতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেশে আসিয়া শুনিলেন—মণিমোহন উন্মাদ অবস্থায় দেশত্যাগী হইয়াছে। তাহার কোনও সন্ধান এ যাবৎ কেহ করে নাই। অধিকন্তু সে যেদিন গৃহত্যাগী হয়, সেই দিন ভবসুন্দরী দেবীর আদেশে দেশের লোক ক্ষিপ্ত মণিমোহনের পশ্চাতে পশ্চাতে গোবর গঙ্গাজল ছড়া দিয়া তাহাকে মৃতের ন্যায় বিদায় দিয়াছে।

দেওয়ানজী আসিয়া পর্য্যন্ত জমীদার-গৃহে যান নাই। সেখানে যাইতে, সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে তার মন আদৌ অগ্রসর হইতেছিল না। তিনি কেবলই মনে করিতেছিলেন, তাঁর কর্ম্মজীবনের সেই প্রথম দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর একমাত্র প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াও অভিভাবকের সমান সম্মানে আহূত হইয়াছিলেন। প্রভু-ভৃত্যের ব্যবহারে কখনও কোনও প্রকারে মর্য্যাদাহানির আশঙ্কা পর্য্যন্ত করেন নাই। নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য স্বর্গীয় বাবুর যে প্রকার লক্ষ্য ছিল, প্রত্যেক লোককে সম্মান দিতে ও তাহাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সেই

প্রকারই লক্ষ্য রাখিতেন। আজ সেই বাড়ীর সেই বংশের ছেলের দ্বারা দেশের লোক উৎপীড়িত হইয়াছে—এবং তাহাকে মৃতের ন্যায় বিদায় দিয়াছে,—সাধারণের বিচারের শাস্তি সে হতভাগ্য নিজে গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছে। এইখানেই যদি এই নাটকের যবনিকা পতন হইত,—এইখানেই যদি এই স্মৃতির একেবারে লোপ হইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যে অতি ভয়ানক শাস্তি—মণিমোহনের ভাগ্যলিপি। এখন কি করিলে এই হতভাগ্যের পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন, তাঁহাদের সুকৃতি নষ্ট না হয়, তাহার উপায় কি? তারপর সেই শুদ্ধাচারী পবিত্র ব্রাহ্মণের অন্তিম অনুরোধ—স্মৃতিতীর্থের শেষ আদেশ, যাহা স্বপ্নে জাগরণে আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সেই হৃদয়-বিদারী স্বপ্নকথা করুণ সুরে আমাকে যেন অনুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে "দেওয়ান মশায় আমার জন্ম-বিবরণ তাঁহাকে শুনাইয়া দিও—আর বলিও তোমার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করিবার ভার লইয়াই তুমি জন্মিয়াছ।" এখন আমি কি করিব? কেমন করিয়া আমার অন্নদাতার বংশের কীর্ত্তি যশঃমান ফিরিয়া পাইব। কোনও আশা নাই; কোনও উদ্যম নাই। এখন আমার এই বার্দ্ধক্যের শেষ শক্তিতে আর কি হইবে? অথবা না করিলেও উপায় নাই; যে কয়দিন বাঁচিয়া আছি, চেষ্টা করিয়া দেখি, ইহার মীমাংসা করিতে পারি কি না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেওয়ানজী জমীদার-বাড়ীতে ভবসুন্দরী দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে ভবসুন্দরী দেবী দেওয়ানজীর সহিত কখনও কথা কহেন নাই, সম্মুখে কখনও বাহির হন নাই। বিশেষ কার্য্যের খাতিরেও মধ্যে একজন লোক রাখিয়া কোনও প্রকারে লজ্জা সঙ্কোচের মধ্যে

জড়সড় ভাবে কথা কহিতেন। কিন্তু আজ সেই প্রৌঢ়া নারী—বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে দেখিতে পাইয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেওয়ানজী ভবসুন্দরীর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"মা, বিপদে অধীর হ'য়ে কর্ত্তব্য হ'তে বিচলিত হ'য়ো না। আর বিপদই কি মা, যে যার প্রাক্তন নিয়ে এখানে এসেছে। তার উপর কারও কোন হাত নাই। যে যার কপাল নিয়ে যাবে আসবে, কাজ করবে, তার জন্য দুঃখ ক'রে সময় নষ্ট করার চেয়ে যা কর্ত্তে হবে, তাতে যেন কোন দুঃখের উৎপত্তি না হয়, এই লক্ষ্য ক'রে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। তোমাকে বেশী কথা বল্‌তে হবে না। তুমি নিজে বুদ্ধিমতী, তোমার বিবেচনা-শক্তি আছে। এখন হা হুতাশ ছেড়ে দিয়ে যাতে তোমার স্বামীর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়, তার ব্যবস্থা কর মা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা যেটুকু করেছিলাম, তার ফল আমাদের উপর দিয়েই শেষ হ'য়ে যাক্। মণিমোহনের পূর্ব্বপুরুষদিগের তার জন্য যেন কোনও ফলভোগী হইতে না হয়, আমাদের এই চেষ্টা করাই উচিত হচ্ছে।"

ভবসুন্দরী দেবী দেওয়ানজীর কথা শুনিয়া একটা মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বাবা, এখানে এসে পর্য্যন্ত অধীর হইনি। যতদূর মানুষে পারে আমি তা সহ্য করেছি; কিন্তু কেন তা জানি না, আজ আপনাকে দেখে আমার আর ধৈর্য্যের বাঁধন রাখ্‌তে পার্‌লাম না। আমার এখন মনে হচ্ছে—আমার মত হতভাগিনী আর কেহ নাই। আমি একেবারে সহায়শূন্যা, একেবারে অনাথা। আমার কি উপায় হবে বাবা। আমি কি ক'রে এত বড় একটা বংশের লুপ্ত সম্মান

উদ্ধার করব। আর কি করেই বা মণিমোহনের পাপ হ'তে তার উর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ বাস রক্ষা করব। যাতে সব রক্ষা হয় তাই করুন। আমাকে অব্যাহতি দিন। আমি এখানে —এ বাড়ীর মাত্র দিন কতকের লোক। যাক্ সে কথা, আপনি যতদিন আছেন ততদিন আমাকে নিশ্চিন্ত হ'তে দিন।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"মা, আমার সব কথা শুনে তবে আমার উপর এ ভার দিও। এখন আমি আর এ বাড়ীর কেহ নহি। এ বাড়ীর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ আমি রাখিনি ; মণিমোহনের উৎপাতে আমি নিজেই একদিন আমার সব সম্বন্ধ শেষ ক'রে কাশীবাসী হয়েছিলাম।"

"আমি জানি এ বাড়ী হ'তে আপনাকে সরাবার ক্ষমতা বাবুর নিজেরও ছিল না, তাঁর ত্যজ্য তো কোন্ ছাড়া। আমায় এক সময় তিনি বলেছিলেন—'যখন কোনও রূপে বিপন্ন হবে, তখনই দেওয়ানজীর শরণাপন্ন হবে।' আমার স্বামীর সেই শেষ আদেশ সব সময়েই আমার মনে পড়ে। তাই আমি প্রথমেই আপনার কাছে কাশীতে এই সব ঘটনার কথা জানাই। তখন আপনার পত্র পেয়ে আমি যেন বুঝতে পেরেছিলাম, মনোরমার জন্য আপনার আর একতিলও সরবার সময় হবে না। সেই সব ভেবেই আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস পাইনি। শেষে আপনাকে না জানিয়েই আমি এখানে আসতে বাধ্য হই। আমার আসাটাও খুব তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল। সেই জন্যই শত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আর কাশী হ'য়ে আসতে পারলাম না। এখান হ'তে লোকের উপর লোক দুঃসংবাদের বোঝা নিয়ে গিয়ে আমার বুকে যেন পাথর চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। শেষে আমি যেন হাঁপিয়ে প'ড়ে ছুটে এখানে চ'লে এলাম। এসে পর্য্যন্ত আমি পাষণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করিনি। সে যাদের উপর অত্যাচার করেছে—যাদের জীবনের উপর দিয়ে মন্দ কর্ম্মের একটানা স্রোত বহিয়ে দিয়েছিল—আমি তাদের দিয়েই তার বিচার করিয়ে তাকে চিরতরে এদেশ হ'তে নির্ব্বাসিত কর্‌বার জন্য যে সময় প্রস্তুত হ'য়ে তার সাম্‌নে যাবার ইচ্ছা কর্‌ছিলাম, ঠিক সেই সময় শুন্‌তে পেলাম অভাগা ছোঁড়াটা পাগলের মত চীৎকার ক'রে বল্‌ছিল—"কে প্রধান,—কর্ম্ম,—না কর্ম্মী,—না কর্ম্মফল!" এখন সে অভিশপ্তের কথা ছেড়ে দিন। এখানে প্রজাদের ব্যবস্থা করেছি, তিন বছর তাদের খাজনা-পত্র আদায় দিতে হবে না। তারা এই দুর্ভিক্ষের সময় কোনও গতিকে রক্ষা পাক্, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কি ব্যবস্থা করা হবে,—আর মনোরমার ছেলেটার সংবাদ কি? তারই বা কি করা যাবে, এ সব আমি ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারিনি; এদের সম্বন্ধে যা কিছু কর্ত্তে হবে, সে ভার আপনি ছাড়া আর কারও কাছে আমি আশা করতে পারি না। এ বিষয়ের কোনও আলোচনাই আমি অন্যের সঙ্গে কর্ত্তে চাই না। আমি কাশীধাম হ'তে আপনার পত্র পেয়েছিলাম। প্রথম পত্রে লিখেছিলেন, মনোরমা যেতে ইচ্ছুক নয়। দ্বিতীয় পত্রে, তার পুত্র হওয়ার কথা ও মনোরমার মৃত্যু-সংবাদ ছিল। এ সব পত্র পেয়ে আমার মন এতদূর খারাপ হয়েছিল যে তা আর কি বল্‌ব,—সেই জন্যই আমি উত্তর দিতে পারিনি। এখন সেই ছেলেটী কোথায়? কি ভাবে আছে?—আর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের সংবাদ কি? তাঁদের ত বৃন্দাবনে কোন সন্ধান পাইনি। আপনি কিছু জানেন কি?"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"আমি শেষ দু'খানি পত্রের উত্তর না পেয়ে আর কোনও পত্র দিইনি। যাক্ তার জন্য বড় আসে যায়নি। এখন

সব কথা শুনুন—বৃন্দাবনে স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দেহত্যাগ করেছেন, তাঁর স্ত্রী গোবিন্দজীর মন্দিরে টাকা জমা দিয়েছেন—তাঁর শেষ কটা দিন সেইখানেই কাটিয়ে দেবেন। তাঁর ছেলেটী ৺কাশীধামে শঙ্করমঠে আশ্রয় নিয়েছেন। সেইখানেই বেদান্তের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন, এই ইচ্ছা। আমি গোপনে এই সন্ধান পেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি দেখা কর্‌লেন না,—বাধা আছে, সময়ে আমি নিজেই সাক্ষাৎ কর্‌ব এই সব ব'লে পাঠালেন। আমিও সময়ে দেখা হবে এই ধারণা করেই সেখান হ'তে চ'লে আস্‌তে বাধ্য হলাম। মনোরমার ছেলেটীর নাম শঙ্করনাথ। সে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট আছে;—বেশ ভালই আছে। মনোরমা শেষ সময়ে ব'লে গেছে, 'যতদিন পর্য্যন্ত ছেলেটী নিজে কৃতবিদ্য হ'য়ে না উঠে, ততদিন সে যেন এই কাশীতে থাক্‌তে পায়—আর এইখানে যেন সে ত্যাগের শিক্ষা পেয়ে তার জন্ম-বিবরণ শুনে জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ ঠিক করে।' সে বিশেষ ক'রে ব'লে গেছে—এমন কি আমাকে একদিন স্বীকার করিয়েই নিয়েছিল যে, 'আমি যেন তাঁর জীবনের প্রত্যেক ইতিহাসটি—তার পিতার প্রতি মণিমোহনের প্রত্যেক ব্যবহারটি পর্য্যন্ত কখনও কোনও রূপে তার পুত্রের নিকটে গোপন না করি। তার পিতার শেষ অনুরোধও যেন সে আমার মুখ হইতেই শুনতে পায় এবং তার জীবনের সমুদায় কর্ম্মই যেন তার পিণ্ড-গৃহীতাদের শান্তির ও মুক্তির হেতু হয়।' আমি শেষ জীবনে এমন একটা গুরুতর সমস্যায় পড়ব তাহা কখন ভাবিনি। আমার জীবনের যত কিছু উদ্দেশ্য ছিল, এখন যেন সব এক হ'য়ে এই ছেলেটীর উপর পড়েছে, পিতা স্বেচ্ছায় কন্যার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে কঠোর তপস্যা কর্ত্তে এসেছে, এরূপ কখনো কল্পনা কর্ত্তে

পারিনি ;—দেখা যাক্ এর সমাপ্তি কোথায় ? এর উপর আমাদের কোনও ইচ্ছাই, কোনও কামনাই, কোন আশাই ক'রে কাজ নাই। ছেলেটীর জীবনের গতি, তার প্রাক্তনের উপর দিয়েই ভেসে যাক। আর সে যদি তার বর্ত্তমান জীবনের প্রবল পুরুষকার প্রভাবে নূতন কোনও পথের আবিষ্কার কর্‌তে পারে, করুক। আমরা শুধু দেখে যাব তার ইচ্ছা কোন্ পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে চায়।"

ভবসুন্দরী দেবী বলিলেন,—"তাই হ'ক্। কিন্তু আমার এখান হ'তে অব্যাহতির উপায় ক'রে দিন। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, একবার মাত্র সেই ছেলেটীকে দেখি। সেই এখন আমার শ্বশুরবংশের শেষ চিহ্ন। আমারও তার উপর একটা কর্ত্তব্য আছে। তার জীবনযাত্রার উপায় তাকে ভাব্‌তে হবে না। মনোরমা যাই বলুক্—আর স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যে আদেশই থাকুক্—শাস্ত্রমতে এ বিবাহ সিদ্ধ হ'ক অসিদ্ধ হ'ক—আমি তার মীমাংসা কর্ত্তে পার্‌বো না ; কিন্তু আমার ধারণা, এই পুত্র আমার শ্বশুর-বংশের। এর পর মণিমোহনের শত বিবাহ হউক—শত পুত্র জন্মাক—কিন্তু এই মনোরমার পুত্রই যে সকলের জ্যেষ্ঠ, এ কথা সব সময় সকলেই বল্‌বে। পিতার অমতে পাত্রীর অজ্ঞানে ইহাদেরই যে হিন্দু-সমাজে প্রথম এই ভাবে বিবাহ হয়েছে তাও নয় ; তাদের পুত্রকন্যাগণ যে সমাজে স্থান পায়নি তাও নয়। আজই এ কথা—এই মণিমোহন ও মনোরমার বিবাহের কথা অন্য আকার ধারণ কর্‌বে কেন, সঘরে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় কুলই ভাঙ্গা যায়। এর বেশী অন্য কথা কখন ত শুনিনি। আমার যতদূর ধারণা, তাতে আমি এই ছেলেকে আমার শ্বশুরের বংশের, এই কুলেরই ব'লে গ্রহণ কর্ত্তে একটুও দ্বিধা করি না। এতে আপনার মত জান্‌তে চাই।"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"মণিমোহনের ছেলে যে এ বংশেরই সন্তান তা সকলেই স্বীকার করবে। একে গ্রহণ করায় কোনও বাধা থাকতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে—সেই ছেলে ভবিষ্যতে তার জীবনের কর্ত্তব্য যখন ঠিক করবে, সে যখন তার মাতামহের অতি নিষ্ঠুর অথচ অতি পবিত্র আদেশ শুনে তার জন্ম-বিবরণ জ্ঞাত হবে—তখন সেই যে এ বংশের শেষ সন্তান হবে;—তা হতেই যে এই বংশলোপ পাবে, তাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। তার মাতামহের আদেশ হচ্ছে—সে চিরজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করবে— আর তার পিতৃমাতৃকুল যাতে পুণ্যচ্যুত না হয়—তাদের সংগতি হয়, এইরূপ কর্ম্মেই চিরজীবন অতিবাহিত করবে।"

ভবসুন্দরী দেবী বলিলেন,—"এত শত তপস্যার ফল। প্রত্যেকেই এই প্রার্থনা করে। এতে আমার কোনও ক্ষোভ নেই—কোন অশান্তি নেই। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট সান্ত্বনার যে আমি এই বংশেরই একজনের উপর,—আমার পৌত্রের উপর—আমার স্বামীর কীর্ত্তিরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারব।"

১৯

ষোল বছর বয়সে শ্রীমান্ শঙ্করনাথ কাশীর সন্ন্যাসী পাঠশালা হইতে বেদান্তের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় কাশীর শিক্ষিত জনমণ্ডলী ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই এই বালকের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবার জন্য দেওয়ানজীর বাড়ীতে প্রায়ই আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন শঙ্করনাথ একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালীর সহিত সকাল হইতে শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে বেলা বারটা

পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল। যতবার বাড়ীর মধ্য হইতে ডাক পড়ে, ততবারই যাই যাই করিয়া তর্ক আরম্ভ করে। অবশেষে বৃদ্ধ দেওয়ানজী শঙ্করের পড়ার ঘরে আসিয়া দেখিলেন—একজন অতিবৃদ্ধ বাঙ্গালী ও শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আলোচনায় এমনই মগ্ন যে তিনি ঘরের মধ্যে আসিয়া তাঁহাদেরই পাশে আসন গ্রহণ করিলেন, তাহা কাহারও লক্ষ্য হইল না। দেওয়ানজী প্রায় আধঘণ্টা চুপ করিয়া এই শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া শঙ্করনাথকে বলিলেন—"তুমি ত বাবু আচ্ছা তার্কিক হ'য়ে পড়েছ-- খাওয়া দাওয়া ত্যাগ ক'রে সেই সকাল হ'তে যে ক্রমাগত ব'কে চলেছ— এতে কি হবে। শেষে কি মাথাটা না বিগড়ে ছাড়বে না। ছেড়ে দাও ওসব নাস্তিকবাদ। সোজাসুজি আমরা যা বুঝি তাই নিয়ে সংসারের পথে ফিরে এসো; উপস্থিত সংসারী হও। ভোগের ইচ্ছেটা জীব মাত্রেরই আছে—আগে তাই শেষ ক'রে নিয়ে তারপর ত্যাগের পথে যেও, কেউ বাধা দেবে না। উপস্থিত খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সকলকে একটু নিশ্চিন্ত হ'তে দাও। আর এই অতি বৃদ্ধের প্রতি এখন একটু দয়ার দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর পিত্তিটা রক্ষা করবার ব্যবস্থা কর।" তারপর সেই বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই গোটাকতক কথা ব'লে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। দয়া ক'রে যখন এ গরীবের ঘরে পায়ের ধূলা দিয়েছেন, তখন আর অমনি ছাড়ছি না। একবার উঠুন; মুখে হাতে জল দিয়ে, অন্নপূর্ণার প্রসাদ দুটী মুখে দেবেন চলুন। তার পর আলাপ করা যাবে।"

অপরিচিত ভদ্রলোকটি যেন একটু লজ্জিত হইয়াই বলিলেন,— "তাইত কথায় কথায় এতটা বেলা হ'য়ে গেছে! আমারই তা লক্ষ্য করা উচিত ছিল,—ছেলে-মানুষের এখনও খাওয়া হয়নি।" তার পর

শঙ্করনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"যাও বাবা, এখন খাওগে, আমিও আসি—আবার সময়ে দেখা করতে চেষ্টা করব।"

শঙ্করনাথ বলিল,—"দাদামহাশয় বলছেন, এইখানেই আপনাকে আহার ক'রে যেতে হবে। আমি ভিতরে গিয়ে বলিগে—আহারের জায়গা কত্তে। কোনও বাধা নাই ত—এইখানেই দুটী সেবা নিলেন ?"

আগন্তুক বলিলেন,—"বাধা কি থাকতে পারে বাবা ;—তোমরাও ব্রাহ্মণ, আমিও তাই। আচ্ছা তাই হ'ক্—তুমি খাবার দিতে বলগে।"

শঙ্কর বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলে—আগন্তুক দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ছেলেটী আপনার কে হয় ?"

দেওয়ানজী বলিলেন,—"আমার সব। একে মানুষ ক'রে তুলতে পারলেই আমার ইহ-পরকাল সব রক্ষা হয়। সম্বন্ধে আমার কেউ নয়। আমার দেশের লোক। এই পর্য্যন্ত। এর বেশী পরিচয় দেবার নেই। মশায়ের নামটী কি ?"

"শ্রীদুর্গাদাস বটব্যাল—পূর্ব্বে নিবাস ছিল নবদ্বীপ। উপস্থিত এখানেই—বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয়ে শেষ জীবনটা কাটাতে এসেছি। জানি না শেষ পর্য্যন্ত ভৈরবের ডাণ্ডা আমাকে খেতে হবে কিনা। শুনছি—এখানে কাল ভৈরব যাকে দয়া ক'রে রাখেন সেই টিকতে পারে—তিনি বিরূপ হলেই স'রে যেতে বাধ্য হ'তে হয়। আমার কপালে কি আছে তা এখনও বুঝতে পারছি না।"

"দেশের মায়া যদি একেবারে কাটিয়ে এসে থাকেন, পিছু চাইবার যদি কেউ না থাকে, তা হ'লে বাবা বিশ্বনাথের নাম স্মরণ করতে করতে দিন কটা কাটিয়ে দেবেন বই কি।"

"পিছু টান যা কিছু ছিল স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা ঘর দ্বার সবই মা গঙ্গা

একদিনে ঝড়ের রাত্রে সবই নিজের পেটে পূরে নিয়েছেন—কেবল রেখে গেছেন—আমার একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ ও তাঁর একটী দশম বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যাকে। সে দুর্যোগের রাত্রে বৌমা ও আমার পৌত্রী সাধনাকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়ীতে ছিলেন। আর আমি ছিলাম কুমিল্লায়। সেখানে আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। এখন পেনসন মাত্র ভরসা ক'রে এই দুইটী জীবকে নিয়ে প্রায় তিন মাস হ'ল এখানে এসেছি। বেশ কেটে যাচ্ছে। এখন মেয়েটাকে কোন সৎপাত্রে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। আজ আমার এক বন্ধুর নিকট শঙ্কর-নাথের রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় শুনে দেখতে এসেছিলাম। যা দেখ্‌লাম, তাতে এর নাম রাখা যে সার্থক হয়েছে তা আমি একশবার বলতে বাধ্য। একে প্রভুপাদ শঙ্কর আচার্য্যের সঙ্গে এক আসনে বসাতে আমার মনে একটু দ্বিধা হয় না। একে আশা করা—বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়া দুইই সমান কথা। এমন জ্ঞানী ছেলে সংসারী হ'লে—হিন্দুর সমাজ নূতন জীবন পাবেই—জ্ঞানময় কর্ম্মে এদের যে দৃঢ় বিশ্বাস তার অঙ্কুর মাত্র আমার জীর্ণ দেহে প্রাণে এমন ভাবে সাড়া দিয়েছে যে, আমার এই আশী বছরের পুরাণ প্রাণটাও এঁর পায়ের নীচে গড়াগড়ি দিতে চাইচে। ধন্য শিক্ষা, ধন্য বিচার-বুদ্ধি। আপনি যদি দয়া করেন তা হ'লে এই ছেলেটির সঙ্গে আমার পৌত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করতে পারি।"

"আচ্ছা, এ সব কথা পরে হবে, এখন চলুন ;—যা হ'ক্ দুটী দিয়ে ক্ষুধাটা নিবৃত্তি করতে হবে। আহারাদির পর এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহা যাবে।"

আহার করিতে বসিয়াও দুই প্রবীণে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। যাহাতে এই বৈশাখেই বিবাহ হইয়া যায়, তাহার জন্য দেওয়ানজীর

কন্যাও অনুরোধ করিলেন। দেওয়ানজী এই বিবাহ সম্বন্ধে এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। কেবল দুর্গাদাসবাবুর মুখে তাঁর বক্তব্য শুনিয়া যাইতেছিলেন। আহারাদির পর সদরে আসিয়া দেওয়ানজী বলিলেন—দুর্গাদাসবাবু, শঙ্করের পিতা এখন জীবিত কি মৃত তা আমি জানি না। তা ছাড়া এর পিতামহী যিনি এর সব ভার নিয়েছেন মাত্র আমার অভিভাবকত্বে রেখে একে লেখা পড়া শেখাচ্ছেন—তিনি এখানে উপস্থিত নাই। তাঁর অমতে আমি কোন কথাই আপনাকে বলতে পাচ্ছি না। খব সম্ভব তিনি এখান হয়েই শ্রীবৃন্দাবন যাবেন। দু' পাঁচ-দিন মধ্যে তাঁর এখানে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এখানে এলেই আপনাকে সংবাদ দেব,—আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা ঠিক করবেন।"

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন—"শঙ্করের পিতা জীবিত কি মৃত সে সন্ধান কি এত দিন পাওয়া যায়নি ?"

দেওয়ানজী বলিলেন—"পাওয়া হয়নি। শঙ্করের পিতামহী তাঁকে নির্ব্বাসিত করেছেন। তা ছাড়া এই শঙ্করের একটা ইতিহাস আছে—তা বলছি শুনুন। আমাদের দেশের জমীদার স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়—তাঁর একমাত্র পুত্র মণিমোহনকে পনর বছর বয়সে ত্যাজ্য-পুত্র করেন। শশাঙ্কমোহনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী—মণি-মোহনের বিমাতা স্বামীর শ্রাদ্ধাদির জন্য পুনরায় তাকে বাড়ীতে আনেন। ভবসুন্দরী দেবীকেই স্বর্গীয় জমীদার বাবু সমস্ত সম্পত্তির দানবিক্রয়ের স্বত্ব দিয়ে যান। কাঁচা বয়সে অনেক টাকার বিষয় হাতে পেয়ে মণিমোহন যথেচ্ছাচারী হ'য়ে পড়েন। শেষে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হন। পিতা মাতার অজ্ঞাতে

কন্যার অজ্ঞান অবস্থায়—তার পিতৃব্যকে দিয়ে সম্প্রদান করিয়ে তাকে বিবাহ করেন। তাঁর নাম মনোরমা। সে বিবাহ হয়েছে ব'লে জানে না;—মণিমোহনকে স্বামী ব'লে স্বীকার করে না। মনোরমার পিতাও পণ্ডিত লোক, তিনি বলেন—এ বিবাহ অসিদ্ধ। এই অবস্থার মধ্যেই এই বালকের—শ্রীমান্ শঙ্করনাথের জন্ম। এখন আপনি বিবেচনা ক'রে দেখুন, এ ছেলের সঙ্গে আপনার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারবেন কি না?"

"আপনার চেয়ে আমি বয়সে ও বহুদর্শিতাতে খুবই ছোট। আপনি আমার চেয়ে সব বিষয়েই বেশী বোঝেন ও জানেন। এ ক্ষেত্রে আমি আপনারই সম্পূর্ণ মতামত প্রার্থনা করি। এখন যা সমাজের অবস্থা তাতে এই সব ব্যাপারের আলোচনা করাই ধৃষ্টতা ব'লে মনে হয়। ঠিক এমনই ব্যাপার আমাদের গ্রামে একটা হয়েছিল। আমার বয়স তখন কুড়ি কি বাইশ হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে ত কই এমন কথা উঠ্‌তে শুনিনি বরং তারাই এখন পয়সার জোরে সমাজের সমাজপতি হ'য়ে পড়েছেন। তা ছাড়া এখন কথা হচ্ছে—শঙ্করের এই বয়সের শিক্ষা, আচার ব্যবহার দেখে যদি সব বিষয় বিচার করা যায়, তা হ'লে একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে প্রাক্তন সুকৃতি না থাক্‌লে—পবিত্র বংশে জন্ম না হ'লে—পূর্ণ ব্রহ্মতেজের মধ্যে এই অল্প দিনের জীবনটা তার এত উজ্জ্বল হ'য়ে কোন রকমেই উঠ্‌তে পার্‌তো না। ষোল বছর বয়সে চতুঃশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া এক শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জীবনীতেই পাওয়া যায়। কারও জীবনে এমনটি আর দেখিনি। শঙ্করনাথের মুখেই শুন্‌লাম, যে বরাবর সংস্কৃতই পড়েছে—আর ইংরাজী বা অন্য ভাষা যা শিখেছে, তা'ত শুনে দেখে—বা নিজের চেষ্টায়। প্রথমটা আমি

কোন রকমেই বুঝতে পারিনি যে এ সব ওর পড়া বিদ্যে নয়; অনেকক্ষণ আমাদের কথাবার্ত্তা ইংরাজীতেই হয়েছিল। খুব সুন্দর চেহারা আর কথার টান শুনে প্রথম দেখেই আমি বাঙ্গালী ব'লে মনে কর্ত্তে পারিনি। কতক্ষণ কথার পর শঙ্করনাথ হেসে বল্লে—'আমরা উভয়েই বাঙ্গালী, তায় ব্রাহ্মণ, নিজেদের ভাষায় বাঙ্গলাতেই আমাদের কথাবার্ত্তা হ'ক্ না কেন? পরের ভাষায় যেন প্রাণ খুলে কথা কইতে পারছি না। আমার এ অক্ষমতার জন্য মাপ করবেন।' তার কথা শুনে আমাকেই তার কাছে দোষ স্বীকার ক'রে বলতে হ'ল—আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বাবা। বাঙ্গালার ভাগ্যে, বাঙ্গালীর ভাগ্যে তুমি যে বাঙ্গালী হয়েই জন্মেছ আমি এ ধারণাই মনে আনতে পারিনি। শঙ্করনাথকে দেখে আমার মনে বড় লোভ হয়েছে—বড় বেশী আশা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে ফেলেছি। এর সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন মন্দ কল্পনাই আসছে না। আপনি দয়া ক'রে আমায় একটু সাহায্য করুন, শঙ্করের পিতামহীর এখানে আসার সংবাদ পেলেই আমি এসে তাঁর হাতে পায়ে ধ'রে—যেমন ক'রে হ'ক্ মত করাবই। এমন স্বভাব, এমন সুন্দর সরল, বিনয়ী, বিদ্বান্, সাধু উদ্দেশ্যপূর্ণ উন্নতিকামী ছেলের জীবনে-জন্মে কখনই কোনও দোষ থাকতে পারে না। যাঁর মন এত পবিত্র, যিনি এতদূর সূক্ষ্মদর্শী ও সমাজজ্ঞ হয়েও নির্ভীক বিচারে সত্যে একনিষ্ঠ তাঁর আশ্রয়ে থেকে তাঁর আদর্শের স্নিগ্ধ ছায়ায়—আজীবন প্রতিপালিত হয়ে তার জন্মগত যদিও কোন মালিন্য থাকে তাও নষ্ট হ'য়ে গেছে;—আমি একথা খুব বড় গলা ক'রে বলতে পারি। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনাদের গুণমুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি।"

২০

ভবসুন্দরী দেবী কাশীধামে আসিয়াছেন, এই সংবাদ দেওয়ানজীর নিকট জ্ঞাত হইয়া দুর্গাদাসবাবুও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়ানজীর বাড়ীতে আসিলেন। দুর্গাদাসবাবুর সকল কথা শুনিয়া ভবসুন্দরী দেবী বলিলেন,—"আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করায় আমার কোনও প্রকারেই অমত নাই। শঙ্করনাথ ছেলে-মানুষ হলেও আমি নিজে সম্পূর্ণ মত দেবার আগে তার মতামত জান্তে চাই। অবশ্য আপনি বল্‌বেন কোন্ ছেলে কবে নিজ মুখে তার অভিভাবকের কাছে বলেছে যে আমি এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক বা বিবাহে মত দিলাম। আমি জীবনে অনেক ঠেকে শিখেছি বলেই আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় কোন কাজ কর্‌বার শক্তিই আর আমার নাই। স্বামীর ত্যজ্য পুত্রকে তাঁর অবর্ত্তমানে পুনরায় গ্রহণ করার পরেই আমার সব শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।—আবার তার পুত্র যে আমার সঙ্গে কি ব্যবহার কর্ব্বে তাও আমি ভেবে নিতে পাচ্ছি না। অবশ্য এখন আমার যা কিছু আছে সবই আমি ওকেই দিয়ে যাব।—কিন্তু এই একান্ত জেদীর বংশে জন্মে শঙ্করনাথ আমার দান তার পূর্ব্বপুরুষের বলেই গ্রহণ কর্ব্বে কি না আমার তাতে সন্দেহ আছে। আমি তার এই ষোল বছর বয়সে তাকে চার পাঁচ বারে দুই দশ দিনের মত দেখেছি। আর এই অল্প দিনেই তার সঙ্গে ব্যবহার ক'রে—আমার যা জ্ঞান হয়েছে—তাতে আমি কোনও কথাই তার উপর জোর ক'রে

বল্‌তে সাহস করি না। আমায় যে সে ভক্তির চক্ষে দেখে না—তা আমি বল্‌তে পারি না। তবে তার জীবনের উদ্দেশ্য সে যে দিক্ দিয়ে নিয়ে যাবে—তাতে আমাদের সংসারের কোনও সম্বন্ধই ও রাখবে না, এ আমি এখন হতেই বল্‌তে পারি। আমার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, ও ততবারই বলেছে—'ঠাকুর-মা, আর কত দিন পরে আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দেবে। তোমার অনুমতি না পেলে স্বামীজী আমায় শিষ্য কর্‌বেন না বলেছেন।' আমার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করেছে। আমিও ব'লে এসেছি বড় হ'লে—মানুষ হ'লে—নিশ্চয় অনুমতি পাবে। কাল রাত্রেও আমার কাছে শুয়ে সে এই কথাই শতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। আমি তাকে কত রকমে বুঝিয়েও সংসারী হবার কথা বলেছি। কিন্তু শঙ্করনাথ কিছুতেই সে কথা শুনে না।—এখন তাকে ডেকে বলুন—বোঝান সে যদি আপনাদের কথায় বোঝে—সংসারী হ'তে রাজী হয় তা হ'লে আমি আপনাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি কোন মতেই তাকে ত্যাগের পথে যাবার অনুমতি দিতে পার্‌ছি না—আমার অক্ষমতা আমি বুঝতে পেরেও আমার মনকে সুপথে চালাতে পার্‌ছি না। আমার একান্ত ইচ্ছা শঙ্করনাথ সংসারী হ'ক্, তার ছেলেদিকে নিয়ে—মানুষ ক'রে আমার ভাঙ্গা ছন্নছাড়া সংসারটা আবার গুছিয়ে তুলি। আমার শ্বশুরের বংশটা আমার চোখের সামনে এমন ক'রে নষ্ট হ'য়ে যাবে—এ দেখ্‌তে, এ কথা ভাব্‌তেও আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে, তা ব'লে জানাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার অনুরোধ আপনারা সকলে মিলে দয়া ক'রে এর একটা বিহিত করুন।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"মা, কার না ইচ্ছা হয় যে আমার বংশের বাড়বাড়ন্ত হ'ক—আমার বংশবৃদ্ধি হ'য়ে দেশের ও দশের কল্যাণ করুক। কিন্তু মা, তোমার মত বুদ্ধিমতীকেও এ কথা বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ভোগের চেয়ে ত্যাগের পথ অনেক বড়। তাই সাধনার ধন। শঙ্করকে ডাক, তার সামনেই আজ এ কথার একটা মীমাংসা হ'য়ে যাক্—সে কি চায়? সে যদি সংসারী হ'তে চায় তবে এই ভদ্রলোকের পৌত্রীকেই বিবাহ করুক। আর যদি সে তার ইচ্ছামত অন্য পথেই যেতে চায়, তবে সে তার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধারের ভার নিয়েই ত্যাগের পথেই যাক্, আমরা সকলেই তাকে হৃষ্টমনে সে পথে যাবার অনুমতি দিই।"

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন—"এত অল্প বয়সে সংসারের বাইরে কত প্রলোভন—সে তা বুঝে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কি এখনই সব ঠিক ক'রে নিতে পারবে?"

দেওয়ানজী বলিলেন—"জীব মাত্রেই তার প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন। এ নিয়ে মাথা ঘামান তত বেশী দরকার করে না। এখন তাকেই সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখা যাক্ সে কি বলে।"

শঙ্করনাথ আসিলে পর দেওয়ানজী তাহাকে বলিলেন, "তোমার ঠাকুর-মাতার ইচ্ছা যে এই বৈশাখে তুমি বিবাহ ক'রে দেশের বাড়ীতে ব'সে বিষয়-আশয় দেখা শুনা কর। আমাদেরও সেই ইচ্ছা। তোমার মত জানবার জন্য ডেকেছি। দুর্গাদাসবাবুর পৌত্রীটিও পরমাসুন্দরী। জাত্যংশে এঁরা তোমাদের কুলের চেয়ে কোন অংশে হীন নন। সঘরও বটে।"

শঙ্করনাথ কিছুক্ষণ ভাবিয়া পরে উত্তর করিল—"আমার বিবাহে

অনেক প্রতিবন্ধক আছে। আমি আমার ষোল বছর বয়স ধ'রে—যা শুনে আস্‌ছি, তাতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য যা ঠিক ক'রে নিয়েছি, আজ আর তা ফেরাবার কোনও উপায়ই আমার হাতে নেই। আমার মাতামহ ও মা দুইজনেই আমায় যে আদেশ ক'রে গেছেন, আমি আপনার মুখেই তা শুনেছি। ঠাকুর-মা আমায় খুবই ভালবাসেন ব'লে হয় ত মোহের বশে তা ভুলে যেতে পারেন ; কিন্তু আমি তা কখনই ভুল্‌তে পারি না। আমি আজীবন সেই মহামন্ত্রকেই স্মরণ ক'রে জগতের কাছে আমার জন্ম-ইতিহাস বল্‌তে কোনও প্রকারে কুণ্ঠিত হব না। আপনিই আমাকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, সে মহামন্ত্র শয়নে—স্বপনে—নিদ্রায়—জাগরণে আমাকে যে ভাবে উদ্‌বুদ্ধ কর্‌ছে, তা আমি আজ সকলের কাছে প্রকাশ ক'রে বল্‌ছি। আমার পরলোকগত মাতামহের আদেশ হচ্ছে ;—'তুমি সংসারের—সমাজের মঙ্গলের জন্য সনাতন প্রথার বিধি-পদ্ধতি রক্ষার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে চিরকুমার থাকিয়া তোমার অসিদ্ধ পিতৃবংশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর মাতৃশক্তি মাতৃপরিচয়ই তোমার জীবনের অবলম্বন।' আমার পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার কর্‌বার ভার নিয়েই আমি জন্মেছি। সনাতন পদ্ধতি রক্ষা কর্‌বার জন্য সমাজের নিয়ম রক্ষার জন্য আমি চির-কৌমার্য্য ব্রত ধারণ ক'রে ঈশ্বর-আরাধনায় জীবনপাত কর্‌বো। আমার জীবনের এ উদ্দেশ্য হ'তে কখনই বিচলিত হব না। অন্য পথে নিয়ে যেতে আপনারা আমায় কোন লোভ দেখাবেন না। এ লোভ-মোহের হাত হ'তে যাতে আমি অতি সহজে অব্যাহতি পেতে পারি, আপনারা সকলে দয়া ক'রে আমাকে সেই পথ ব'লে দিন। এ সংসারে আমার অন্য কোন কাম্য বস্তু নাই।" শঙ্করনাথ আর কোনও কথা বলিতে পারিল

না। অদম্য অশ্রু উৎসে তাহার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়া দিল। শঙ্কর-নাথ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। উপস্থিত সকলেই কতকক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে কাটাইয়া দিলেন।

অবশেষে দুর্গাদাসবাবু বলিলেন,—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই তেজস্বী বালকের হয়েই আপনাদের অনুরোধ করি একে আপনারা সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়ে তার কর্ত্তব্যের পথ প্রশস্ত ক'রে দিন। এর কখন পাতিত্য আস্‌বে না। আমি আমার মন প্রাণ এক ক'রে, আশীর্ব্বাদ করি ভগবান্ যেন শঙ্করনাথের পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হন।"

২১

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের কাশীধামের মঠে শঙ্করনাথ বহু পূর্ব্ব হইতেই যাতায়াত করিত। প্রায় প্রতিদিনই বৈকালে এখানে আসিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিত। এইখানেই তার বেদান্তের প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়। তারপর মঠের অধ্যক্ষ স্বামীজী তীর্থভ্রমণে বাহির হন বলিয়া শঙ্করনাথ কাশীর সন্ন্যাসী পাঠশালায় পড়িত বটে, কিন্তু বেদান্তের আলোচনা এই মঠের প্রত্যেক স্বামীজীর নিকট যে ভাবে শুনিত, তাহাতেই তাহার পাঠের বিশেষ সুবিধা হইত। আজ স্বামীজী তীর্থ হইতে ফিরিয়াছেন শুনিয়া শঙ্করনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। অনেক কথাবার্ত্তার পর শঙ্করনাথ স্বামীজীকে বলিলেন—"স্বামীজী এবার আমায় সন্ন্যাস দিতে হচ্ছে—আর আমি কোন কথাই শুন্‌ছি না। আমি ঠাকুর-মার অনুমতি পেয়েছি। আপনার অপেক্ষায় আমি কতদিন ধ'রে ব'সে রয়েছি। আর কোনও আপত্তি তুলে আমাকে

ভুলিয়ে আবার ফিরিয়ে দিবেন না ? আমি অনন্যশরণ হ'য়ে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি।"

স্বামীজী খুব গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন—"দেখ বালক, সন্ন্যাস জিনিসটা দূর থেকে যত সোজা ব'লে মনে করেছ এটা তত সোজা নয়। এ ব্রত বিশেষ। এর প্রত্যেক বিধি অনুষ্ঠানাদি এত কঠোর যে—তোমার মত শিশুর তরুণ বুদ্ধিতে—নরম শরীরে তা কোন প্রকারেই অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষে কর্ত্তে পার্‌বে না। দিন কতক সংসারের ভোগে ক্ষণিক আনন্দের স্বাদ পেয়ে এস। তার পর এই কঠোরতাময় সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে ত্যাগে যে পরম পবিত্র পূর্ণানন্দ আছে তা কেবলমাত্র বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রো ; পাবার আশা করেছ কি মরেছ।"

স্বামীজী এই কথা বলেই হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর হাসির শব্দে মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সকলকে সম্মুখে জিজ্ঞাসু ভাবে উপস্থিত দেখিয়া তিনি বল্লেন "ওগো তোমাদের দল পুষ্ট কর্‌বার জন্য এই বিদ্যার্থী এখানে এসেছেন। এখন তোমাদের কি অভিমত। তোমরা কি এঁকে সন্ন্যাস নেবার জন্য পরামর্শ দিয়েছ না কি ? —কি করা যায় বল দেখি ?"

যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্য হইতে নিত্যানন্দ স্বামী বল্লেন—"ও ত অনেকদিন থেকেই আমাদের কাছে বল্‌ছিল যে স্বামীজী বলেছেন,—ঠাকুর-মার মত পেলেই আমাকেও আপনাদের মত একটা কিছু নাম দিয়ে বিশ্ব-স্বামী ক'রে নেবেন স্বীকার আছেন। প্রায় প্রতিদিনই ওকে বল্‌তে হ'ত যে বৈশাখী পূর্ণিমার আর ক'দিন দেরী আছে। আমি একদিন উপহাস ক'রে ওকে বলেছিলাম—এ বৎসর পাঁজীতে বৈশাখী পূর্ণিমা লেখে নাই। তাতে ও আমায় বলেছিল আর পাঁচিশ দিন পরে স্বামীজী এসে

আমার জন্য নূতন পাঁজী সৃষ্টি ক'রে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠাবেন। তখন আপনাকে ডেকে দেখাব আমার স্বামীজীর প্রত্যেক বাক্যই অভ্রান্ত। তবে আমার কোন্ 'আনন্দ' নাম রাখ্‌বেন সে বিষয়ে যদি আমার নিজের মত জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে আমি বেশ স্পষ্ট ক'রে বল্‌বো যেন আমার নাম দেন 'উদরানন্দ'। এই কথা শুনে আমরা সকলেই তখন না হেসে থাকৃতে পারিনি। এখন ওর ইচ্ছামত ঐ নামটী ওকে দিয়েই—ঘরের ছেলে ঘরে যেতে ব'লে দিন।"

শুদ্ধানন্দ স্বামী বল্লেন—"স্বামীজী, আজকের দিনটা না হয় ওর উদরকে আনন্দে পরিণত করবার জন্য সুযোগ দিতে এখানেই ভূরি-ভোজের ব্যবস্থার আজ্ঞা ক'রে দিন।"

ব্রহ্মানন্দ স্বামী বল্লেন—"আহা, তোমরা যেন শঙ্করনাথকে কিই পেয়েছ! আমি বলি কি যদি স্বামীজীর অনুমতি হয় তা হ'লে ও এই বয়সে কিসের লোভে এখানে আস্‌তে চাইচে তা আমাদের সকলের সামনে খুলে বলুক্। ওর কি হ'তে এত বড় একটা বিরাট্ বৈরাগ্যের উৎপত্তি হ'ল, সেটা না জেনে ও সন্ন্যাসী হ'ক্ এ কথা আমি বলতে পারি না। ও যে দু'পাতা বেদান্ত প'ড়ে—মস্ত বড় একটা উপাধি নিয়ে, পড়া বিদ্যের উপরেই সংসারটার অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিচ্ছে এর একটা উৎকৃষ্ট হেতু নিশ্চয়ই আছে। সেটা ওর বল্‌তে বাধা থাকতেই পারে না। ও যখন সন্ন্যাসী হ'তে বসেছে, তখন ওর গোপন কিছু থাকৃতে পারে না, বিশেষ গুরুর কাছে গোপনই পাপ। কি বল হে শঙ্করনাথ?"

শঙ্করের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পরমানন্দ স্বামী বল্লেন, "নিজেদের প্রথম দিনের অবস্থা স্মরণ ক'রে তবে এ সব কথা জিজ্ঞাসাবাদ কল্লে

ভাল হয় না। ওর কোন হেতু থাক্ না থাক তা নিয়ে কথা হচ্ছে না। ও ত স্পষ্ট ক'রে বলেছে, স্বামীজী বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে ওকে সন্ন্যাস দেবেন এই প্রকার আশা পেয়েছে। এখন দেখ না বাপু তিনিই কি করেন।”

গঙ্গাপুরীজী বল্লেন, “কিহে পরমানন্দ, শঙ্করনাথের পক্ষ থেকে ওকালত-নামা পেয়েছ না কি—না ভেতরে ভেতরে কিছু ব্যবস্থা ক'রে আমাদের এই ত্যাগের পথে বসেই একটা উপায়ের পথ ক'রে নিচ্ছ।”

শঙ্করনাথ এঁদের বাক্যবাণে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, “আমাকে উপলক্ষ ক'রে নিজেদের মধ্যে আর বিবাদ কর্‌বেন না। তা ছাড়া আপনাদের এই পথটা আমার যত লোভের ব'লে মনে হচ্ছিল তা এখনই সে লোভটা ক'মে আস্‌তে চাইচে। সংসার জিনিষটা ভাল কি মন্দ তা না বুঝ্‌লেও এটা বেশ বুঝেছি যে সেখানে গুরুদেবের সামনে বাচালতা কেউ বড় একটা করে না। তারা সব সময় তাঁর সম্মান রেখে—তাঁকে দেবতার সমান আসনে বসিয়ে পূজো কর্‌তে পারে;—করেও তা। দয়া ক'রে আপনারা একটু স্থির হ'ন। আমি যাঁর উপর আমার ইহ-পরকালের সব ভার দিতে যাচ্ছি, তাঁকে আমার সব কথা বলবার একটু সুযোগ দিন। আর যদি কোনও বাধা না থাকে, আপনারাও আমাদের গুরু-শিষ্যের কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পারেন। এর মধ্যেই আমার প্রতি আপনাদের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নেরও উত্তর শুন্‌তে পাবেন। আমি যাঁকে আমার সকল বিষয়েরই ভার দিতে এসেছি, তাঁর কাছে কোনও কথাই গোপন রাখব না—আমি কেন, প্রত্যেক শিষ্যই তার গুরুর নিকট জীবনের আদ্যন্ত প্রকাশ ক'রে থাকে। তবে গুরুদেবের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি এ সব কথা বলতে পার্‌ছি না।”

স্বামীজী বল্লেন, "শঙ্করনাথ, এতদিন তোমাকে যে চোখে দেখে এসেছি, তোমাকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়ে এসেছি, তা সবই অন্য পথের। যদি মনে প্রাণে—কায়মনোবাক্যে স্থির ক'রে থাক যে ত্যাগের পথে এসে জ্ঞানার্জ্জন করবে, মুমুক্ষু হবে,—জ্ঞানে মুক্তি লাভ করবে, তবে এ পথে এসে কঠোর তপস্যা কর। এ ছাড়া যদি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এ পথে পা দাও তা হ'লে এস না বাবা। কোনও প্রকারে একটা সিদ্ধি লাভ করবে; তামাকে সোনা করতে শিখবে কি এইরূপ আর যা তা উদ্দেশ্য মনের মধ্যে পোষণ ক'রে এখানে এসো, তা হ'লে পদে পদে পাতিত্যে প'ড়ে ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্ট হবে। কামনা বাসনা-হীন না হ'লে ত্যাগের পথেও বিপদ্ বড় কম নয়। মনকে নিঃসঙ্গ করতে হবে। চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করতে হবে। কামিনী কাঞ্চনের,—শুধু কামিনী কাঞ্চন কেন পঞ্চভূতটিই যে অবিদ্যা এই কথাটা মনে প্রাণে বুঝে—উপলব্ধি ক'রে, ভূতাতীত নিরঞ্জন হ'তে হবে। বুঝেছ সে সব ক'জনে আয়ত্ত কর্ত্তে পারে। তার পর এই নশ্বর চেহারা নিয়ে ঘরের বার হচ্ছ। তোমার এ বিশ্বে কোনও বস্তু কাম্য না থাকতে পারে; আর সকলেই যা কিছু সুন্দর তাই পাবার চেষ্টা করে। তুমি না হয় সুন্দরীর দিকে চাইলে না,—তার রূপে মুগ্ধ হ'লে না; কিন্তু সে কেন যে তোমার দিকে চাইবে না,—তোমার এই সদা প্রফুল্ল সুন্দর স্বভাবটি গ্রাস করবে না? সে ত তোমায় শত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করবেই। আর সংসারের নিয়মই এই হচ্চে যে, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, তাই আগে পাবার আশা করা। তাতে লাভ ক্ষতি হিসেব রেখে চলে না। তুমি আমি চাই নিত্য শাশ্বত অবিনাশী পরমানন্দময় জ্ঞান। আর প্রায় সকলেই চায় সৌন্দর্য্য; তা ফুলের মত ক্ষণিকের

স্থায়ী সৌন্দর্য্যই হ’ক্ বা পূতিগন্ধে ভরা ক্ষণিক সুখের আধার নারীর রূপ-সৌন্দর্য্যই হউক। ক’জনে বলতে পারে বাবা—

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে।”

শঙ্করনাথ স্বামীজীর পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া বলিল, “আমার মনকে এমন ভাবে তৈরী ক’রে নিতে যে পেরেছি, তা আমি বলতে পারি না। আমার সকল কথা শুনে আমার প্রতি দয়ার বিচার ক’রে ব’লে দিন—আমার মত অবস্থায় প’ড়ে মানুষ কোন্ পথে যাবে? আমার সন্ন্যাসে অধিকার আছে কি না? আপনি আমার সকল কথা শুনে যে ব্যবস্থা ক’রে দেবেন, আমি আমার দেবতার আদেশ ব’লে চির জীবনের কর্ম্মে তাই মাথা পেতে নেব।”

শঙ্করনাথ সেই সন্ন্যাসীমণ্ডলীর মধ্যে তাহার জন্ম-বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিল। একে একে তার মাতামহের প্রথম আদেশ হইতে মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, আজও সে নিজের ধারণায় দুর্গাদাসবাবুর নিকট যাহা বলিয়াছে; তাহার পিতামহী তাহাকে যে ভাবে সন্ন্যাস লইতে অনুমতি দিয়াছেন সকলই বলিল। মাতামহের স্বপ্নাদেশও যাহা দেওয়ানজীর মুখে শুনিয়াছিল তাহাও বলিতে বিস্মৃত হইল না।

স্বামীজী শঙ্করনাথের জীবনের ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন, “পুরাণে যাবালি উপাখ্যান পড়েছিলাম; তাতে ধারণা হয়েছিল সেকালে সত্যের

সেবা ব্রাহ্মণে যে ভাবে কর্‌তো তার পূর্ণ আদর্শ এই যাবালি চরিত্র। যাবালি অকপটে ঋষির নিকট তার জন্ম-বৃত্তান্ত বলতে পেরেছিল বলেই ঋষি তাকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ অধিকার হ'তে বঞ্চিত করেন নি। ঋষিরাও তার সত্য নিষ্ঠাতেই তাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাকে শিষ্যত্বে বরণ ক'রে বেদে পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন। আর আজ আমি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই বিদ্যাপীঠে ব'সে কেমন ক'রে বলবো যে তোমার সন্ন্যাসে অধিকার নাই? তুমি তোমার জন্মগত ব্রাহ্মণ্য শক্তিতে ভারতে যে কর্ম্ম-বীজ রোপণ কর্ত্তে এসেছ, আমি যত দূর পারি তার সাহায্য কর্‌বো। আমিও বলি, তুমি তোমার মাতামহের আদেশ রক্ষা কর; তুমি তোমার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধারের ভার নিয়েই জন্মেছ; সনাতন পদ্ধতি রক্ষা কর্‌তে, সমাজের নিয়ম রক্ষা কর্‌তে তুমি চির-কৌমার্য্য ব্রত ধারণ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনায় জীবনপাত কর। তোমার এ সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ক; শ্রীগুরুর কৃপায় তুমি যাতিস্মর হ'য়ে তোমার কর্ম্মের বল আরও দৃঢ় ক'রে সংসারের মঙ্গল-পথ প্রশস্ত ক'রে তোল। তোমার মত আরও যারা সংসারে এসেছে ও আস্‌বে,—তারা যেন তোমার কর্ম্ম তাদের জীবনের আদর্শ ক'রে লয়। তোমার পথ দিয়ে চলেই যেন তারাও তাদের পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার ক'রে **সন্তান** নাম সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারে। এস কর্ম্মবীর—এস! তোমার মত সু-সন্তানের গুরু হওয়া ভারতের গুরুকুলের পক্ষে বহু গৌরবের কথা। আমি তোমার গুরুত্বে আজ যে গৌরব অনুভব কচ্ছি, এ যে কত আনন্দের তা আমি ব্যক্ত কর্‌তে অক্ষম।"

২২

মণিমোহন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এমন স্থানে আসিয়া পৌছিল যে, সেখানে কেহই কাহারও ভাষা বুঝিতে পারিতেছে না। এতদিন তবুও কোনও প্রকারে ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল মিলিয়াছিল। যেখানে গিয়াছে সেইখানের লোকেই এই পাগল অভুক্তকে দয়া করিয়া যাহা হউক কিছু দিয়াছে,—তাহাতেই সে প্রাণধারণ করিয়াছিল—কিন্তু আজ সে যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানে সকলই অদ্ভুত। যেখানে আসিয়াছে সেখানের লোকে কাপড়ের বদলে গাছের ছাল পরে। ভাতের বদলে জীবজন্তু খায়। মায়া মমতা বর্জ্জিত। প্রত্যেক নরনারীই যেন বীভৎসতার এক একটা প্রতিমূর্ত্তি। তাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া মণিমোহনের মনে হইল, সভ্যতা বর্জ্জিত—উন্নতিতে চেষ্টাহীন হ'য়ে এই সাঁওতাল, কোল, ভিল, এদের জঘন্য জীবন যাপনেও এরা যতটুকু আনন্দ উপভোগ কচ্ছে,—এই নগ্ন প্রকৃতির বুকের উপর প'ড়ে মানুষ মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে,—আমার জীবনের সমস্ত কাজই এদের চেয়েও অতি হীন—অতি নিকৃষ্ট, তা আমি এখন অম্লান বদনে স্বীকার কর্ত্তে পারি। কিন্তু এখন এ স্বীকারের কোনও মূল্যই নাই। নিজেকে এমন ভয়ঙ্কর স্থানে টেনে এনেছি যে এখানে বাস কর্ত্তে এদের মধ্যেও এদের মতই জীবনটা কাটিয়ে দিতে সাহসে কুলাচ্ছে না। এরাও আমার জীবনের ইতিহাস শুনতে পেলে আমার কৃত কর্ম্মের শাস্তি দিতে ছুটে আস্‌বে। এদেরও হয় ত রাগ হবে। এরা

অসভ্য হ'ক্—কেউ কারো প্রতি কোন সহানুভূতি না দেখাক্, পরস্পরে সংস্রব রহিত হয়ে থাক্—এদের হ'তে কেউ নিরাশ্রয় হচ্ছে না। কারও সাজান সংসার শ্মশানে পরিণত কচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রীতে মুখোমুখি ব'সে শিকারলব্ধ জীবগুলো অর্দ্ধদগ্ধ ক'রে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খাচ্ছে। এদের ব্যবহার দেখে বেশ মনে হচ্ছে আমি এদের চেয়েও সহস্রাংশে ঘৃণ্য নিকৃষ্ট। এই অরণ্যের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদের পাশেও নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—এই ঘৃণ্য জীবনের প্রতি তবুও মায়া মমতা তিলমাত্র কমেনি, এখনও শত সহস্র কামনা-বাসনা মনের মধ্যে উঁকি মারুছে। তখন মনে করেছিলাম যেখানে ভোগের কিছুই নাই সেখানে গেলেই ত ভোগের সাধ মিটে যাবে। মানুষ যেখানে নেই—যেখানে সভ্যতার আচরণে চরম অসভ্যতা নেই সেখানে গেলেই সব আপদের শান্তি হবে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তা হয় না। সামনে ভোগের কিছু না পেলেই যে তা হ'তে মানুষ অব্যাহতি পাবে তা হয় না। মনের সাধ সবই সঙ্গে সঙ্গে এখান পর্য্যন্ত যেন ছুটে চ'লে এসেছে। এখন কি করি কোথায় যাই; কেমন ক'রে আমার কৃত কর্ম্মের মন্দস্মৃতি হ'তে নিষ্কৃতি পাই—আমায় কে নিষ্কৃতি দেবে? এই দুর্গম বনে এই সাঁওতালের দলের মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় তৃষ্ণার জ্বালায় কতক্ষণ এভাবে থাকৃব—আর পারি না। এখান হ'তে ফিরে যাই। নিজের কৃত কর্ম্মের পাপ হ'তে যাতে চিরতরে অব্যাহতি পাই তার পথ ঠিক ক'রে নিতে আবার সমাজের দ্বারেই দ্বারস্থ হইগে।

মণিমোহন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আবার দেশে আসিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় তৃষ্ণার জ্বালায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সে সেই সাঁওতালের দেশের মধ্যেই ছুটাছুটি করিতে

আরম্ভ করিল। আর শত শত সাঁওতাল তীর ধনুক লইয়া মণিমোহনকে মারিয়া ফেলিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

মণিমোহন সাঁওতালদের হাতে পড়িয়া অশেষবিধ নিগ্রহ ভোগ করিতে করিতে শেষে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সেখান হইতে পলাইবার আর কোন পথই নাই। সম্মুখে খরস্রোতা নদী, পশ্চাতে শত সহস্র ক্ষিপ্ত সাঁওতালের উদ্যত তীর ধনুক। উভয় পার্শ্বেই দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গ। অনন্যোপায় মণিমোহন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসাদে,—সংসারের গুরুভারে,—মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়া এ নর জগতের যত লোক মৃত্যুকে আহ্বান করে, মৃত্যু যদি সকলেরই সে আহ্বানে দেখা দিয়া, তাহাদের জীবনের ভার ঘুচাইয়া কাছে টানিয়া লন,—তাহা হইলে আর কোনও কথা ছিল না; সকলেরই ইচ্ছামৃত্যু হইত। সময় না হইলে তিনি কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হন না। কোথাও শত-সহস্র আহ্বানে তিনি আসেন না, আবার কোথাও আহ্বানের পূর্ব্বেই অতি অতর্কিতে আসিয়া নিজের অখণ্ড প্রতাপ দেখাইয়া থাকেন। মৃত্যুর করালগতি অতি ভয়াবহ, অতি বিচিত্র। এই বিচিত্র-গতি-মৃত্যু সংসারে নিত্য যে লীলা করিতেছেন, তাহাই অতি কঠোর নিয়তির অখণ্ড প্রতাপ। সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভয়-চকিত দৃষ্টিতে এই নিয়তির দিকে চাহিয়া কালের স্রোতে ভাসমান হইয়া জীবনযাত্রা চালাইতেছে। সকলকেই একদিন তাঁহার নিকট ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাইতেই হইবে। ইহা জানিয়াও তাঁহার নিকট যাইতে কেহই প্রস্তুত থাকে না। আবার স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হইয়াও কেহ যাইতে পারে না।

নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াই মণিমোহন সেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু নদীতে পড়িয়া আবার কতক্ষণ প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শেষে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিতে চলিতে কখন যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাহার মনে হয় না। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন দেখিল এক সন্ন্যাসীর আশ্রমের মধ্যে সে পড়িয়া রহিয়াছে; আর গৈরিক বস্ত্র পরিহিত অতি সুন্দর, সৌম্য শান্ত এক তরুণ সন্ন্যাসী তাহার সেবায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। মণি-মোহনের ইচ্ছা হইল, একবার সে শুধু জিজ্ঞাসা করে, সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে, আর কেই বা তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে বাঁচাইয়া এখানে আনিয়াছে। কিন্তু সেই তরুণ সন্ন্যাসীটি তাহার মুখের অবস্থায় জিজ্ঞাসু ভাব বুঝিতে পারিয়াই সঙ্কেতে তাহাকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন।

মণিমোহন তাহা বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসীকে ইসারায় জানাইল; সে কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে অস্থির হইয়া উঠিল। আজ সর্ব্ব প্রথম মণিমোহন কৃত-কর্ম্মের জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

আজ মণিমোহনের ইচ্ছা হইল, সে চীৎকার করিয়া এই সন্ন্যাসীর নিকট তার গত জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটি বলিয়া হৃদয়ের ভার কতকটা লাঘব করে। সে এত দিনের মধ্যে এত কর্ম্ম-বিপাকে পড়িয়া স্বেচ্ছায় উন্মাদ হইয়াছে, তবুও জীবনে একদিনের জন্য—একবারের জন্য ভাবিয়া দেখে নাই যে, তাহারই কৃতকর্ম্ম তাহাকে এমন অবস্থায় আনিয়া এমন ভাবে কর্ম্মফল ভোগ করাইবে। জ্ঞানে অজ্ঞানে সে এমন করিয়া কখনও ভাবে নাই যে, কর্ম্মই কর্ম্মীকে আয়ত্ত করিয়া কর্ম্মের ফল

ভোগ করাইতে বাধ্য করে। সে একদিন এই কথার মীমাংসা করিতে যাইয়া বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ সে নিজ কৃতকর্ম্ম দোষেই এই বিজন অরণ্যের মধ্যে মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্থান পাইয়াও প্রাণ খুলিয়া নিজ কৃতকর্ম্মের গ্লানি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। এখন সে কোন্ পথে যাইবে, কোন্ কর্ম্ম করিয়া গত জীবনের কর্ম্মবিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইবে, তাহাও জানিয়া লইতে পারিতেছে না। এমনই দুশ্চিন্তার সহস্র বৃশ্চিক দংশনে অস্থির হইয়া মণিমোহন যে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে লাগিল, তাহাতেই সে আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জ্ঞান অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে প্রায় মাসাবধি রোগ-শয্যায় পড়িয়া রহিল। একমাস পরে যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান পাইয়া রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারিল,—তখন সে দেখিল তাহার সেই নিটোল সুগৌর দেহ কঙ্কালসার মসীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার দক্ষিণাঙ্গ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভগবান্ দয়া করিয়া তাহার ভগ্নস্বরে কথা বলিবার একটুমাত্র শক্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সেই তরুণ সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাঁহার একান্ত যত্নে ও শুশ্রূষায় মণিমোহন কোনও প্রকারে একটু বল পাইয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া নড়িতে চড়িতে পারিল। মণিমোহন একদিন সেই সন্ন্যাসীকে ধরিয়া বসিল, তাহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটি তাঁহাকে শুনিতে হইবে। তিনি সব শুনিয়া বলিয়া দিন, এখন সে কি করিবে?—কোথায় যাইবে? কি ভাবে তাহার জীবন কাটাইবে?

সন্ন্যাসী মণিমোহনের জীবন-কথা শুনিয়া বলিলেন "মণিমোহন বাবু,—আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে না, আমি আপনার

জীবনের সমস্ত ঘটনাই জানি,—আপনার জীবনের সঙ্গে একদিন আমার জীবনও জড়িত ছিল। আমিই আপনাদের দেশের সেই নিষ্ঠাবান্ পবিত্রচেতা পূজ্যপাদ স্বর্গীয় জয়রাম স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুত্র। আমারই সংসারাশ্রমে নাম ছিল—শ্রীকমলারঞ্জন দেবশর্ম্মা। এখন আমি সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী; এ আশ্রমে গুরুদত্ত নাম বিজয়ানন্দ। গুরুর আদেশে সাধনার জন্য এখানে আসিয়াছি।

"আপনি বৃথা অনুতপ্ত হয়ে জীবনে স্পৃহাশূন্য হবেন না। মনোরমার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্র শঙ্করনাথ কাশীধামে বেদান্তের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে কাশীর বিদ্বৎসমাজে গণ্য-মান্য হয়েছেন কিন্তু শঙ্করনাথ দেওয়ানজীর মুখে তার মাতার ও মাতামহের আদেশ শুনে, তাই জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছে। তাঁদের আদেশ হচ্চে 'তুমি সংসারের—সমাজের মঙ্গলের জন্য সনাতন প্রথার বিধি পদ্ধতি রক্ষার জন্য চিরকুমার থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন পূর্ব্বক তোমার অসিদ্ধ পিতৃবংশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর মাতৃশক্তি মাতৃ-পরিচয়ই তোমার জীবনের অবলম্বন।' শঙ্করনাথ তার পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার কর্‌বার জন্য ত্যাগের পথে এসে সন্ন্যাস নিয়েছে। তার এখন গুরু-দত্ত নাম সন্তান। তারই মত যারা এ সংসারে এসেছে;—আবার যারা আস্‌বে তারাও যাতে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার কর্‌তে পারে,—তাদেরও সন্তান নাম সার্থক করে তুল্‌তে পারে,—শঙ্করনাথ সে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। গুরুর কৃপায় সে এখন যাতিস্মর হয়েছে—তার কর্ম্ম,—তার সাধনা সন্তান-ধর্ম্ম ব'লে ভারতে প্রচার হচ্ছে। আর এই সন্তান-ধর্ম্ম প্রত্যেক সন্তানের আদর্শ হবে।

"দেওয়ানজীর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর কাছে

শুনলাম আপনার বিমাতা ভবসুন্দরী দেবী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সন্তানদের শিক্ষার জন্য দান করে তীর্থবাসিনী হয়েছেন।

"আমাদের মনে আপনার উপর—শুধু আপনার উপর কেন, এ বিশ্বের উপর কোনও ক্ষোভ নাই। আমি ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এ বিশ্বের মঙ্গল প্রার্থনা করি ;—তিনি আপনারও মনে শান্তি দিন। প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে পড়ে যা ঘটবার তা ঘটেছে। তার জন্য অনুতাপ করে বৃথা সময়ক্ষেপে কোনও ফল হবে না। এখন তাঁর নাম নিয়ে তাঁর নির্দ্দেশমত কার্য্য করে, অবশিষ্ট জীবন যাতে পবিত্র ভাবে কাটাতে পারেন, তাই করুন। ভগবানের আদেশ হচ্ছে, ফলাফলে অনাসক্ত হয়ে সব কাজ করা, কর্ম্মফল তাঁকে উৎসর্গ করা। এ কর্ম্মভূমি ভারতে দেবতারাও কর্ম্ম সাধনা কর্ত্তে আসেন। এখানে যখন আমরা জন্মেছি, এ পুণ্যভূমিতে যখন আমাদের প্রথম বাক্-স্ফূরণ হয়েছে, তখন কেন আমরা তাঁকে ভুলে সংস্কারে গা ভাসিয়ে চলে যাবো। তিনিও কতবার এই পুণ্যভূমিতে এই ভারতে কর্ম্মের সাধনা কর্ত্তেই অবতার হয়ে জন্মে, কর্ম্ম করে গেছেন,—আদর্শ কর্ম্ম আমাদের শিখিয়ে গেছেন।—আমরা তাঁরই আদিষ্ট কর্ম্মে জীবনপাত করে মুক্ত হব। আসুন, আজ আমরা দুজনে সমস্বরে তাঁর গুণ কীর্ত্তন করে শক্তি সঞ্চয় করি। তিনি স্বেচ্ছায় মায়ায় আবৃত হয়ে যে পথে চলে আবার মুক্ত হয়ে ছিলেন ; আজ আমরাও নিজেদের মুক্ত কর্ত্তে সেই পথে চলি।"

মণিমোহন তখন সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে আপনার ভগ্নস্বর যথাসম্ভব মিলাইয়া ভক্তিভরে স্তব পড়িতে লাগিল—

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্ ।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন চ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ ।
ন বাক্যানি পাদৌ ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ ।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু